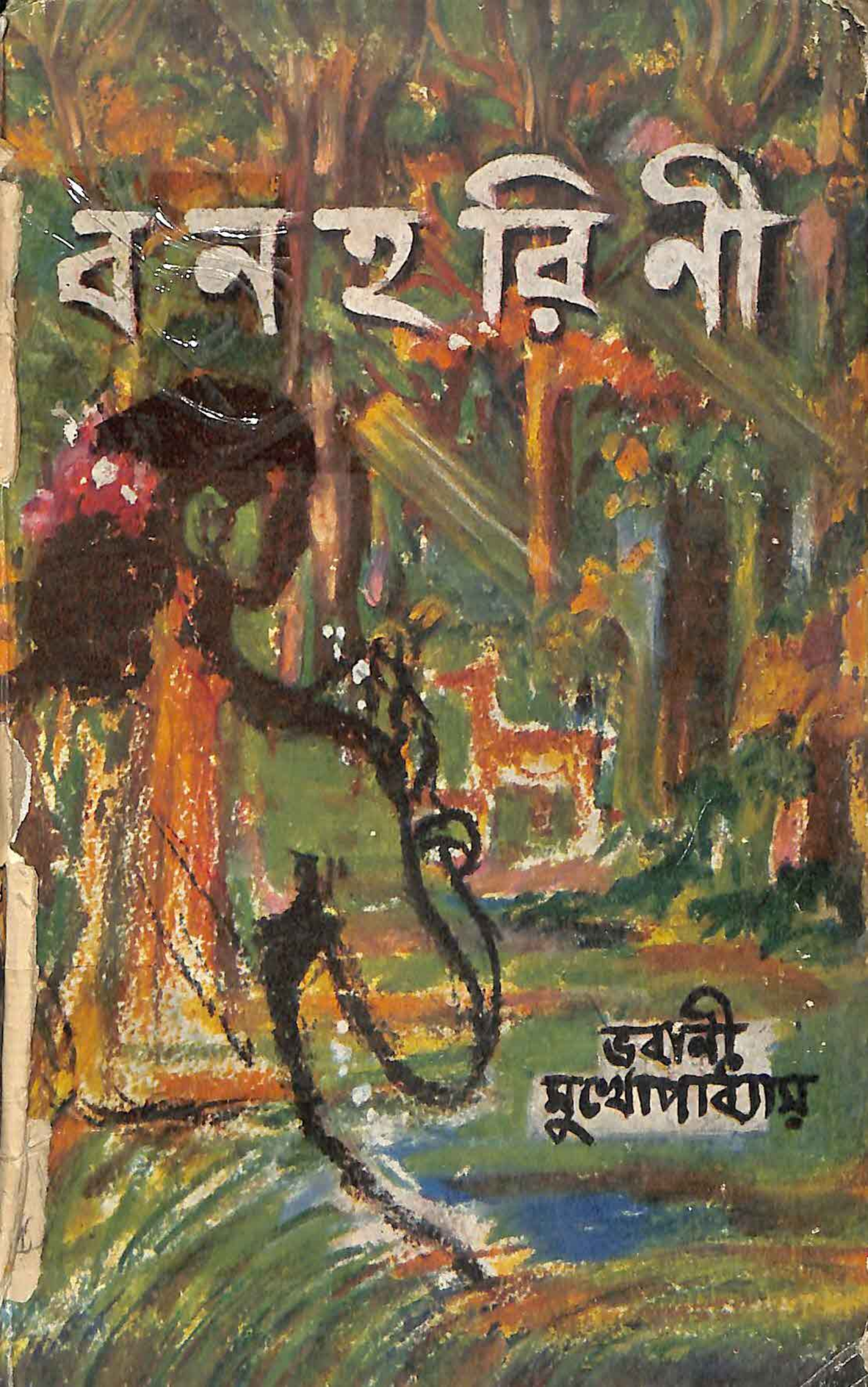

বনহরিণী
ভবানী মুখোপাধ্যায়

বনহরিণী



ভবানী মুখোপাধ্যায়

নবভারতী
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫ জুন

প্রকাশক
সুনীল দাশগুপ্ত
নবভারতী
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
সন্তোষকুমার ধর
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
অন্নদা মুনসী

পাকিস্তান প্রাপ্তিস্থান
বইঘর
চট্টগ্রাম

দুই টাকা আট আনা।

বিদ্যুৎবহ্নি
বাতায়ণ
বিরহ মিলন কথা
দাগ
অভিনয়
শিশু
আয়না
রজনীগন্ধা
জননী
বনহরিণী

প্রাণতোষ ঘটক

প্রীতিভাজনেষু

বিদ্যুৎ-বহ্নি

কৃষ্ণার মার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, ছোটবেলায় একত্রে খেলা করেছি, একই পাঠশালায় পড়েছি, তারপর বড় হয়েও কিছু না কিছু যোগসূত্র রয়ে গেছে। এখন আমরা উভয়েই চল্লিশের সীমানা পার হয়েছি, আমাকে অবশ্য বয়সের উপযোগী মনে হয়। কিন্তু কৃষ্ণার মা বিভাবতীকে বয়সের অনুপাতে অনেক ছোট মনে হয়। মেয়েদের যদিও অতি অল্প বয়সেই বার্ধক্য আসে তবু বিভার শরীরে এখনও জরা স্পর্শ করেনি। এখনও আমার সঙ্গে ওর প্রীতির সম্পর্ক বজায় আছে, সাধারণত তা থাকে না,—মেয়েদের সঙ্গে ত' নয়ই, ছোটবেলার অনেক পুরুষ বন্ধুও বুড়ো বয়সে হারিয়ে যায়। দুটো কারণে অবশ্য এই মৈত্রী ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রথমত আমি যখন উদীয়মান লেখক হিসাবে রীতিমত কসরত করছি, তখনই মঞ্চ ও পর্দার সে খ্যাতনামা অভিনেত্রী, আর কিছুকাল সে আমার বন্ধু সিনেমা জগতের হারাধন চক্রবর্তীর স্ত্রী হয়ে সংসারী হওয়ার চেষ্টা করেছিল, সেই সময়—যাক্ সে সব কথা, এখানে না বলাই ভালো, এ কাহিনীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার যোগও নেই।

এই কাহিনী আমার আত্মকাহিনী নয়, বিভাবতীর জীবন কথাও নয়, এই কাহিনী বিভাবতীর একমাত্র সন্তান কৃষ্ণার কাহিনী।

বিভাবতীর চিরদিন মনে মনে ধারণা যে তার অসংখ্য প্রেমলীলার ফলেই সে অভিনেত্রী হিসাবে সাফল্য লাভ করেছে। তার আরো বিশ্বাস ছিল সুখী হতে হলে স্ত্রীলোককে বার বার প্রেমে পড়তে হবে, এবং প্রেমের সাগরে ডুবে থাকতে হবে। কৃষ্ণার জন্মের পর বিভাবতী স্থির করে যে তাকে 'মুক্ত, স্বচ্ছন্দ এবং স্বাধীন'ভাবে গড়ে তুলতে হবে। কৃষ্ণার জীবনের প্রথম কয়েক বছর এই ভারটা রইল এক নার্সের ওপর, তারপর তাকে কার্সিয়ং না কোথায় এক ফিরিঙ্গীদের স্কুলে ভরতি করে এল বিভাবতী। ছুটিতে সে যখন কলকাতায় আসত, তখন যাঁরা পড়াতেন তাদের উপর কড়া নজর রাখতো বিভাবতী, উগ্র নীতিবাদের চাপে মেয়েটা না শুকিয়ে যায়, এই তার ভয়।

ছোট্ট মেয়ে কৃষ্ণা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দুটি টলটলে ডাগর চোখ আর তার ওপর পাতলা জোড়া ভুরু, টিকোলো নাক, আর ঘন কৃষ্ণবর্ণ চুল, আকারেও বাঙালী মেয়ের অনুপাতে একটু লম্বা, সব জড়িয়ে একটা বিদেশী ছাপ কোথায় যেন পাওয়া যায়। বিভাবতী বলত—আমি আমার মেয়ের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিশবো। ওকে ওর খুশিমত চলতে বলবো, কোনো কিছুতেই বাধা দেব না। ওকে আমি মনের মত করে গড়ে তুলবো।

আমার মনে হয় হয়ত, বিভাবতীর মনে মনে একটা উদ্‌বেগ ছিল, কিছুতেই যেন কৃষ্ণার ওপর একটা ঈর্ষার ভাব না জাগে।—ওর খ্যাতির আকাশ যেন মেঘে না ঢাকা পড়ে। এই সেদিনও যখন বয়স হয়েছে, তখনও দু-একটা ভূমিকায় ও কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছে। মাঝে মাঝে আয়নায় নিজের চোখ আর মুখ চুপ করে দেখত বিভাবতী, বার্ধক্যের পদধ্বনি তাকে ক্রমেই শঙ্কিত করে তুলছে। এই রকম এক সময় হঠাৎ একদিন আমাকে বলে বসলো,—"ইচ্ছে হয় একদিন ঘুম ভেঙে উঠে কেমন দেখতে হয় আমাকে তা নিজের চোখেই দেখি"—তারপর হঠাৎ একটু থেমে বললে—"কৃষ্ণাটা তেমন সুন্দরী হবে না, তবে ওকে দেখতে হবে চমৎকার।"

কৃষ্ণা মেয়েটা বয়সের অনুপাতে একটু বেশী গম্ভীর, ওর দিকে তাকালেই কেবল চুপ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে ওকে বেড়াতে নিয়ে যেতাম,—কখনো সখনো হয়ত বলে বসতো—'আপনি বুড়ো হয়েছেন কিছু জানেন না,—তখন একটু বেয়াড়া শোনাতো। ওর বয়সের হিসাবে কত কি যে জানে,—ওদের বয়সে আমরা কথাই বলতে পারতাম না।

চোদ্দ বছর বয়সে মেয়েটা কেমন অদ্ভুত বদ্‌মেজাজী হয়ে উঠল, মাথার চুল উস্‌কো-ঘুস্‌কো, জিভের কি ধার! কি যে বলে বসবে ঠিক নেই! এ সব ব্যাপারে ওর মার হয়ত সমর্থন ছিল, জানিনা বিভাবতীর কি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল। আমার মাঝে মাঝে অতি বিশ্রী মনে হ'ত।

সেবার স্কুলে ফিরে যাওয়ার সময় হঠাৎ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, চলে গেল। আমি নিঃসন্তান, সেই প্রথম বুঝলাম সন্তানহীনতার জ্বালা। ও চলে যাওয়ার পর আমিও কাঁদলাম,—মনকে বোঝালাম, থাকলেই বা কি করতাম তাদের নিয়ে!

কৃষ্ণার যে রকম আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে গেল, কোনো মেয়েকে এত তাড়াতাড়ি বদ্‌লাতে কখনো দেখিনি। সেই বছরেই প্রায় চার ইঞ্চি মাথায় বাড়লো, ছোট মেয়েটি স্কার্ট ছেড়ে সাড়ি ধরলো, শরীরটাও যেন শীর্ণ হ'ল। মাথায় খোঁপা বাঁধতে শিখেছে, তাতে শাদা ফুল দিয়ে সাজায়—কত হরেক রকম সাড়ি আর ব্লাউজের আবদার। নিজের কথাই তার কাছে বড়ো, আর সকলের কথার সে প্রতিবাদ করবেই, তবে সেটা করবে হাসিমুখে। পাছে তার ব্যবহার রূঢ় হয়ে পড়ে তাই সর্বদা সতর্ক থাকে। গলার স্বরটাও পালটে গেল।—বিশেষ লক্ষ্য রাখে যাতে কোনো অপ্রীতিকর কথা না মুখ দিয়ে বেরোয়, আমাদের চাইতেও সতর্ক।

ঠিক কুড়িতেই বি, এ পাশ ক'রে ইতিহাস নিয়ে পোষ্ট-গ্রাজুয়েটে ঢুক্‌লো কৃষ্ণা। আমার বউবাজারের হুজরীমল লেনের ছোট্ট বাসায় বেশী সময় কাটাতে সে ভালো বাস্‌তো। বয়সের সঙ্গে কৃষ্ণার রূপও দেখবার মতো হ'ল,—মাঝে মনে হ'ত ওর মাকে সে ছাড়িয়ে চলে গেছে। মেয়েটি চট্‌পট্ সব কথা বুঝে নেয়, বুদ্ধিও বেশ প্রখর। ওর মার অন্যান্য বন্ধুরা ভাবতেন মেয়েটি দাম্ভিক ও মুখরা, কিন্তু তা নয়। ওর তীক্ষ্ণ ভঙ্গীর ফলে ওকে বোঝা কঠিন। শুধু আমার কাছে এসে ও মাঝে সাঝে কাঁদ্‌তো। আর কেউ বোধকরি ওর চোখের জল দেখেনি।

এদিকে বিভাবতী হিসেব করে বসে আছে মেয়েটা প্রেমে পড়ুক, যেন ছিপ হাতে করে মাছ ধরার আশায় বসে আছে বিভাবতী। তাহলে মেয়ের মা হিসাবে ওর কর্তব্য পালন করে বিভাবতী। বল্‌ত, "মেয়েটার কারো সঙ্গে আলাপই হ'ল না এখনো। বরাত দেখো।"

আমিই প্রথম হালদারের কথা শুনি,—প্রথমে হালদার, তারপর রণজিত হালদার, অবশেষে শুধু রণজিত। ছেলেটাও ওরই বয়সী প্রায়, অর্থাৎ কুড়ি একুশ বছরই বয়স, যেন দুটি সমবয়সী ছেলেমেয়ে একত্রে মানুষ হচ্ছে।

এর পরের সপ্তাহে রণজিতকে মার কাছে নিয়ে গেল কৃষ্ণা, পরিচয় করিয়ে দেবে, ছেলেটি পড়াশোনায় ভালো। কিন্তু ফলটা ভালো হ'ল না। প্রথম দর্শনে রণজিতের বিভাবতীকে তেমন ভালো লাগলো না, এবং বিভাবতীকে সন্তুষ্ট করার তার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ মনে হ'ল। আমিও সেদিন ওদের বাসায়

ছিলাম, রণজিত চলে যাওয়ার পর বিভাবতী তার ধীর মৃদু কণ্ঠস্বরকে ব্যঙ্গ করতে লাগলো। ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণা তখন তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেছে। নইলে হয়ত একটা কাণ্ড হয়ে যেত। আমি তার আগের দিন বলেছিলাম,—'কৃষ্ণা, তোমার মার কাছে যাওয়ার আগে ওর জামাটা পাল্‌টানো দরকার।'

এই কথায় চটে উঠে কৃষ্ণা বলেছিল—"ও গরীব হয়ে জন্মেছে সেটা ত' আর ওর অপরাধ নয়।"

রণজিতের মা একটু স্বার্থপর ধরনের, স্বামী ছিলেন এক নামকরা সওদাগরী অফিসের বড়বাবু, সেই হিসাবে কিছু 'উইডো পেনশন' পেয়ে থাকেন। বারবার তিনি রণজিতকে বলেন, এমন উড়োন চণ্ডী মার্কা ছেলে না থাক্‌লে তিনি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাক্‌তেন। ফলে রণজিতের অর্থকষ্ট প্রবল, দু-একটি ট্যুইশনি করে কলকাতার বাসা খরচ চালাতে হয়, শুনেছি প্রতিদিন বেলগাছিয়া থেকে হেঁটে য়ুনিভার্সিটি আসে—আর কৃষ্ণা সর্বদাই তার সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট। আমারই ঘরে বসে ওরা কি সব বই কিনতে হবে তার আলোচনা করছিল, টাকার কথায় কৃষ্ণা কিছু দিতে চায়, ফলে ঠোঁট কামড়ে রণজিত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এ বিষয়ে ছেলেটি অতিরিক্ত অভিমানী। আমার দিকে একবার বাঁকা চোখে তাকিয়ে কৃষ্ণা অমনি পিছনে ছুটলো। আমি শুন্‌তে পেলাম বারান্দায় ওরা কথা বল্‌ছে, হঠাৎ কৃষ্ণা বেশ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কি যে হ'ল কে জানে, তারপর উভয়ে ফিরে এল, কৃষ্ণার মুখে বিজয়িনীর দীপ্ত ভঙ্গী।

ছেলেটির ভঙ্গীটা বড় মনোরম, যদি বোঝে কেউ তাকে অপছন্দ করছে, কিংবা সে অবাঞ্ছিত; তখনই সে সেখান থেকে সরে পড়বে। শৈশব থেকেই অবহেলিত হওয়ার ফলে এতটুকু করুণা বা সৌজন্যের স্পর্শ কোথাও পেলে তার মনে সংশয় জাগে। কৃষ্ণাকে সে উপাসনা করতে সুরু করেছে যেহেতু উভয়ে প্রেমে পড়েছে, আবার সন্দেহের দোলায় দুল্‌ছে, পেয়ে হারানোর ভয়। অনেক দূর অবধি পাড়ি দিতে তাই তার বড় আশংকা। কিন্তু কৃষ্ণাকে সে ভালোবাসে, একাগ্র চিত্তে ভালোবাসে। আর স্বার্থ বুদ্ধির ফলে জীবনে সে এতটুকু স্নেহস্পর্শ পায়নি, তাই কৃষ্ণার ভালোবাসায় সে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে। সাধারণত স্বার্থপর জননীদের সন্তানরা কিঞ্চিৎ উদার ও মহৎ স্বভাবের হয়ে থাকে।

রণজিতের এক দূর সম্পর্কের কাকার ছোট্ট একটি ওষুধের কারখানা ছিল, সেখানে ম্যালেরিয়ার টনিক, কেশ তৈল, আর দাঁতের মাজন তৈরি হ'ত। বৃদ্ধ রণজিতকে স্নেহ করতেন, রণজিত উপযুক্ত হলে তাকে তাঁর কারবারে নিয়ে নেবেন এমন আশ্বাসও দিয়েছিলেন। সহসা সব গোলমাল হয়ে গেল, বৃদ্ধ করোনারি থ্রমবোসিসের প্রথম আঘাতে কাবু হলেন, সেরে উঠলেন বটে, তবে তাঁর বেশী ভরসা নেই। তাই রণজিতকে পড়া ছেড়ে সোজাসুজি ব্যবসা দেখার জন্য ডেকে পাঠালেন।

রণজিত আর কৃষ্ণা আমার বাসায় দৌড়ে এল এই সংবাদ নিয়ে।

ওরা দুটিতে অদ্ভুত প্রাণী, এখন পর্যন্ত ওদের মুখে একটা আদরের সম্ভাষণ শুনিনি। উভয়ে উভয়কে 'বোকা, 'ইডিয়ট', 'মুখ্খু' এমন কি 'গাধা' পর্যন্ত বলত—অনেক সময়ে ওরা একত্রে না এসে আলাদা আস্‌তো, তারপর দ্বিতীয় প্রাণী কিছু পরে এসে বল্‌ত—'বোকাটা গেল কোথায় ?' যেন দুটি ভাই বোন, উপমাটা খারাপ শোনায় নইলে বলতাম যেন দুটি সুন্দর পপির মতো দেখায় ওদের। দিনরাত হাস্‌ছে, ঝগড়া করছে, তর্ক করছে, অভিমান হচ্ছে, আবার ভাবও হচ্ছে। আমার এই বাসাটাই ওদের মিলন ক্ষেত্র, আমাকে ওরা নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করেছে।

এই দিন কিন্তু এতই উত্তেজিত হয়েছে দুজনে যে শান্ত কণ্ঠে কথা বলতে পারছে না, এ ওকে বাধা দিচ্ছে, তর্ক করছে, রীতিমত কলহ। শেষটায় কৃষ্ণা ধাক্কা দিয়ে অসতর্ক রণজিতকে সোফার ওপর ঠেলে ফেলে দিল। তারপর সজোরে তার পাশেই বসে পড়লো, রণজিত বেচারী হাঁফাচ্ছে।

"জানেন মেশোমশাই, আপনি আগে আমার কথাটা শুনুন, আমি ওকে বল্‌ছি, এখনই কাকার সঙ্গে দেখা ক'রে কাজটা হাতে নিতে—'

"তাহ'লে তোমাদের বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়—তাই না ?"

কৃষ্ণা লজ্জিত ভঙ্গীতে হাস্‌লো। রণজিত একটু দম নিয়ে বল্‌ল—"কি করে বিয়ে হবে বলুন, প্রথমটা মাসে একশ থেকে দেড়শ টাকার বেশী এলাওয়েন্স পাওয়া যাবে না। ঐ টাকায় কি বিয়ে করা যায়, গাধাটা বুঝতে পারছে না।"

"বুঝতে খুব পারছি, তুমিই একটি সিলি এ্যাস্‌।"

"এ সব একস্‌পেরিমেণ্ট চলে না, বুঝলে—"

"চালাতেই হ'বে, নইলে বিয়ে হবে কি করে—?"

"আমি তোমায় বিয়ে করবো না—"

শেষটায় একটা মীমাংসায় না পৌঁছতে পেরে এক রকম জোর করে ওদের বার করে দিলাম, আমার সামনে একটা মীমাংসা করতে হয়ত বাধছে।

সিঁড়ি বেয়ে নামার সময়ও ওদের উচ্চকণ্ঠ আমার কানে পৌঁছালো, বুঝলাম সমস্যার সমাধান হ'চ্ছে না।

পরদিন কৃষ্ণা গম্ভীর মুখে আমার কাছে এল। রণজিত রাজী হয়েছে। ওর কাকার কাজেই যাবে। বিয়েটাও এখনই হবে, যদি ওর টাকাতেই কৃষ্ণা চালাতে পারে, এবং বিভাবতীর কাছে হাত পাততে না হয়।

"জানেন, মেশোমশাই, কাল এখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা আউটরাম ঘাট গেছি আবার সেখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরেছি। তারপর ও শেষটায় রাজী হ'ল।

অর্থাৎ বউবাজার থেকে আউটরাম ঘাট সেখান থেকে আবার গোখেল রোড। সাধে কবি বলেছেন 'যৌবনে দাও রাজটীকা'!

"তারপর আমিও কাঁদি ওরও চোখে জল, মানে দুজনে একটু টায়ার্ড হয়ে গিছলাম কিনা। পরে দুজনেই হেসে ফেল্‌লাম। আমিই জিতলাম, কেমন আপনাকে বলিনি। আচ্ছা, মেশোমশাই, আপনার বাসায় যদি প্রথম দিকটায় থাকি আপনার লেখাপড়ার অসুবিধা হবে?"

"অসুবিধা আর কি, ছেলে-পুলে থাক্‌লেই যা হাঙ্গাম, তা তোমরা দুজনেও ছেলে বইত নয়। কিন্তু কৃষ্ণা তোমার মা মত দিয়েছেন এই বিয়েতে?"

কৃষ্ণা আমার মুখের পানে ভাবহীন ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল, তার চোখ দুটো যেন সহসা পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। কি গম্ভীর মুখ!

"আজ সকালে বলেছিলাম।"

"কি বললেন?"

"হেসে উঠল, বল্‌ল, "ঐ ষ্টুপিডটাকে বিয়ে করবি, কি বল! দু-চারদিন এক সঙ্গে মেলামেশা করতে পারিস, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বিয়ে, রামোচন্দর। খাওয়াবে কি?"

"তা র প র?"

বল্লাম, "আমার তা ইচ্ছা নয়, আমি ওকে বিয়ে করবোই, এই বলে ঘর থেকে চলে এলাম। মেশোমশাই, মার ওভাবে কথা বলা ঠিক হয়নি। জানেন, আমার ভয় হয় রণজুকে না অমন কিছু বলে বসে, সে ক্ষেপে লাল হয়ে উঠবে। দেখবেন আপনি—! এখানে এলে আমাদের সব কিছুই যোগাড় করে নিতে হবে, না মেশোমশাই?"

আমি স্পষ্টই বললাম আমি এতে খুশীই হব। কৃষ্ণা একথায় বিস্মিত হ'ল না বা তেমন স্বস্তির ভাব দেখালো না, সে নিঃশব্দে চলে গেল। তখনো এটা বুঝিনি, রণজিতকে হারানোর ভয় তার সবচেয়ে বেশী। এমনই রণজিতের আত্মাভিমান যে কোনো একটা কথার সূত্র ধরে সে হয়ত ঠিক করে নেবে, ও বোধহয় তেমন 'সিরিয়স' নয়। যা বুঝলাম শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে না পড়া পর্যন্ত রণজিত এই বিবাহে সম্মত হয়নি। আহা, কৃষ্ণার কতই বা বয়স,— দুজনেই এখনও তেইশ-চব্বিশের কোঠায়। কৃষ্ণা ভয়ে ভয়ে আছে, পাছে বিভাবতী রণজিতকে কোনো কটু কথা বলে বসে, আর রণজিত বেঁকে বসে, তাহলেই আবার নতুন করে সব করতে হবে ওকে। কাগজ-কলম রেখে দিয়ে ছুটলাম গোখেল রোডে বিভাবতীর বাড়ি।

বিভাবতী খুবই চটেছে কৃষ্ণার উপর। চটার চাইতেও বেশী, অর্থাৎ সে হতাশ হয়ে পড়েছে, কৃষ্ণা তাকে বসিয়ে দিয়েছে। রণজিত সম্পর্কে একবার বললো 'সেই ওষুধের দোকানের ছোঁড়াটা'। ওর সঙ্গে মেলামেশা করে আমি ভাবি, কি পেয়েছে ওর মধ্যে কে জানে! ঐ ত' চেহারা! তা না হয় একত্রে পড়াশোনা করে, মিশুক, কিন্তু তাই বলে বিয়ে! জানো, মেয়েটা ওকে 'বোকারাম' বলে ডাকে—যাকে নিজেই বোকা বলে জানিস তাকেই বিয়ে! কি হয়েছে জানো, যাকে প্রথম দেখেছে তাকেই ভালোবেসে বসে আছে। ওরকম কত আসবে কত যাবে! কুড়ি একুশ বছরের মেয়ে, এখনই বিয়ে! মাস খানেকের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠবে দেখো।

প্রথমটা প্রাণভরে মনের কথা বলতে দিলাম বিভাবতীকে, তারপর একটু ঠাণ্ডা করে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম রণজিতকে যেন কিছু না বলে!

বাড়ি ফিরে এসে দেখি তুমুল কাণ্ড, কৃষ্ণা আর রণজিত দুজনে আমার রান্নাঘরে ঢুকে হৈ চৈ বাধিয়েছে। নিজেরাই সব ঠিক ঠাক করছে, সাজাচ্ছে,

এমন সময় বুঝি রণজিতের হাত থেকে একটা প্লেট পড়ে ভেঙে গেছে। তাই এত হল্লা। কৃষ্ণা ওর চুল ধরে টানছে, বলছে—"মেশোমশায়ের চায়ের সেটটা ভাঙলে, কি বলবেন উনি বলোত, তুমি একটা গাধা।" রণজিতও চটেছে এবং বোধকরি কৃষ্ণার চুল ধরবার উপক্রম করছে এমন সময় আমি গিয়ে পড়েছি। আমি চিনেমাটির প্লেটটা হাতে তুলে নিয়ে দুজনকেই একটু বকলুম, ফলে ওরা যেন স্কুলের ছাত্রের মত চুপ করে দাড়িয়ে রইল। ভাবতে লাগলাম, এই কি প্রেম? ঘর থেকে বেরোবার সময় শুনলাম—'তোমার লেগেছে নাকি কৃষ্ণা! দেখলাম কৃষ্ণা মাথা নাড়লো, আর রণজিতের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে চলে এলাম। নিজের কথা মনে হ'ল।—চল্লিশ কবে পার হয়েছি, এখন আমি প্রৌঢ়, ওদের মনের কথা আমি কতটুকু বুঝি! জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিক নূতন যুগের রণ-কৌশলের সঙ্গে পরিচয় কই!

কৃষ্ণা য়ুনিভার্সিটির ক্লাস করা বন্ধ করলো। সিকস্‌থ ইয়ারের মাঝামাঝি কাল। সমস্ত সময়টা কাটায় কৃষ্ণা বেলেঘাটা অঞ্চলে ছোটখাটো বাড়ির খোঁজে। ঐ অঞ্চলেই ওষুধের কারখানা।

রাতে যাওয়ার সময় ওদের কত কথা, সারাদিনের হিসাব নিকাশ, জীবনের প্রতিটি খুঁটি-নাটির অন্তহীন আলোচনা। অবশেষে কৃষ্ণার একটা বাড়ি পছন্দ হয়ে গেল, মাসে ত্রিশ টাকা ভাড়া,—দু'খানি ঘর, একটি রান্না-ভাঁড়ার, আলাদা বাথরুম, একরকম লটারির টাকা পাওয়ার মতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার ঘটনা, তাই সেলামীটা আর দিতে হয়নি। কারখানা থেকে টিফিনের সময় বেরিয়ে পড়ে রণজিতও একবার ফ্ল্যাটটা দেখে এসেছে।

সেই সন্ধ্যায় কি কি আসবাব পত্র লাগবে, সংসারের নানান টুকিটাকি জিনিসের ফর্দ, মায় কখানি তোয়ালে কিনতে হবে তার হিসাব পর্যন্ত।

অতিকষ্টে রণজিতকে বোঝালাম কৃষ্ণা যদি তার মার কাছ থেকে মাসে শ'খানেক টাকা নেয় তাতে এমন কিছু সম্মান ক্ষুন্ন হবে না, বরং সেই টাকায় কিছু আসবাবপত্র কেনাও চলবে। বিবাহের যৌতুক হিসাবে আমিও শ' পাঁচেক টাকা দেব বললাম।

কৃষ্ণা নানারকম মাপ জোক করে দোকানে দোকানে ঘুরে পর্দার কাপড় কিনে আনল, পর্দা টাঙাবার রিঙ, আরো কত কি।

এক সময় ওকে নিরালায় পেয়ে বললাম—"আচ্ছা কৃষ্ণা, রান্না করে, ঘর সংসারের কাজ করে তোমার মত কনভেণ্টে পড়া মেয়ের ক্লান্তি আসবে না। সারাদিন ত' রণজিত বাড়ি থাকবেনা, সে সময়টা কি ভাবে কাটবে! তার চেয়ে এম. এ-ট পাশ করে ফেলো। একটা ভালো দেখে চাকর রাখো, রান্নাবান্নার কাজটা সেই চালিয়ে নেবে।"

"ওর কষ্টের উপার্জন এই ভাবে নষ্ট করবো, না মেশোমশাই, তা আমি পারবো না, আমি সাধারণ মেয়ে, আমার তেমন কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। আমি ঘর-সংসারের কাজ করেই খুশীতে থাকবো।"

কথাটা সেদিন তেমন বিশ্বাস করিনি। একটা বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা আধুনিক মেয়ে যে এইতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে তা কোনোদিন ভাবিনি। এই জীবনের সঙ্গে ওর ঠাকুমার জীবনের আকৃতিগত পার্থক্য কোথায়!

রণজিত বড়ই একগুঁয়ে, ওদের অর্ধেক কলহের মূল সেইখানে। আমার মনে হ'ত রণজিতকে ক্ষেপিয়ে তুলে তারপর শান্ত করতে কৃষ্ণার ভালোই লাগত। এর মধ্যে একটা মাতৃসুলভ মনস্তত্ত্ব লুকানো আছে। জীবনের প্রথম প্রেম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা সর্বশেষ প্রেমের চাইতেও অনেক অস্বস্তিকর।

একবার যদি কোনো রকমে মনের গভীরে বাসা বাঁধে, তাহলে তাকে ভোলা বড়ই কঠিন, পৃথিবীতে এত বড়, এত প্রেরণাময় অনুভূতি আর কিছু নেই।

যেদিন ওদের এই নতুন বাসা সে স্বচক্ষে দেখলো বিভাবতীর রাগের আর সীমা রইলো না। ছোট ছোট দু'খানি ঘর, (বিভাবতীর মতে পায়রার খোপ), রাস্তার দিকে অবশ্য মুখ আছে, এক ফালি বারান্দাও আছে। নীচের তলায় থাকে চট্টগ্রামের এক দাশশর্মারা। কর্তা শিয়ালদার রেলে কাজ করেন। গিন্নীর বিশাল চেহারা, যেমন লম্বা তেমনই চওড়া। কে বলবে বাংলার মাটিতে এই স্বাস্থ্য বিকশিত হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণার সঙ্গে এর মধ্যেই ভারী ভাব। ওকে বুঝি কি ভাবে ইলিশ মাছের পাতুরি রাঁধতে হয় তাই শেখাতে আসছিলেন, আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন। বিভাবতী ত' তাঁকে রীতিমত অপমানই করলো, অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে একটাও কথা বললো না।

চটেছিল বিভাবতী, তাই রণজিত সম্পর্কে যা মুখে এলো বলে গেল। সব চুপ করে শুনে জবাব দিল কৃষ্ণা। সে সব সহ্য করতে পারে কিন্তু রণজিতের

অপমান তার সয় না, এ বিষয়ে সে দক্ষকন্যা সতীরই সমতুল্য। ওর কণ্ঠস্বর ও দীপ্তভঙ্গী দেখে আমি সেদিন বুঝেছিলাম যে আর যাই হোক—যেখানে রণজিত আর কৃষ্ণার হাত সেখানে আর কারো প্রবেশাধিকার নেই। আর কারো কথা সে কানে তুলবে না। এর ফলে এই হ'ল যে বিভাবতীর টাকা আর কিছুতেই সে ছোঁবে না।

বিভাবতীর রাগও কমলো না।—মেয়েটা যে সুখী হয়েছে, শান্তিতে আছে এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না বিভাবতী। এই বিবাহটা যেন মনে ব্যক্তিগত অপমানের মত বি ধছে।

বিভাবতী ছাড়া আর কেউ হ'লে বিষয়টির এইখানেই নিষ্পত্তি হ'ত। বড়জোর কেউ কারো মুখ দেখতো না, নয় ক্ষমা করতো, অজ্ঞানের অপরাধ ভুলে যেত। বিভাবতীর মনে কিন্তু এই সব 'রোমান্টিক' মেয়েলীপনার স্থান নেই, তাই বিবাহ সম্পর্কে সেও নানারকম কথা ভাবতে লাগল। ভাবল এই কষ্ট, এই অর্থাভাব নিয়েই রণজিতের সঙ্গে লড়াই বাঁধবে, তখন একেবারে মুঠোর ভেতর আসবে কৃষ্ণা। টাকা চাইবে, উপদেশ চাইবে, বলবে—'মা, কি ভুলই করেছি।—আর প্রসন্নচিত্তে বিভাবতী বলবে "ঠিক হায়, কৃষ্ণা, শক্ত হও। জীবন আর যৌবন এক নয়, একই অভিজ্ঞতার দুটি বিভিন্ন শব্দ—জীবনের জয়পতাকা উড়িয়ে দাও—তাতে লেখ' ভোগেই চরম সুখ।' মানব-দেহ পেয়েছ ভোগ করে নাও, জীবনের সকল আনন্দ অঞ্জলি ভরে আকণ্ঠ পান করে নাও।"

কৃষ্ণাকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে। দু-চারজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। থিয়েটারের প্রথম রজনী বা সিনেমায় ডাকতে হবে।

নিমন্ত্রণ পেয়ে কৃষ্ণা বলে উঠল—"ওকেও নিয়ে যাবো ত' ?"

"আর যে টিকিট নেই,—একঘণ্টাও ছেড়ে থাকতে পারবি না ? না, তোকে বুঝি কোথাও যেতে দেয় না !"

কৃষ্ণা হাসে, নিমন্ত্রণ রাখে না। হয়ত প্রথম রজনীর অভিনয় দেখে আনন্দ পাওয়া যেত, থিয়েটার আর সিনেমায় কার অরুচি। কিন্তু রণজিতহীন সন্ধ্যা অর্থহীন। বিভাবতী কিন্তু এই সহজ কথাটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তা নয় কৃষ্ণা প্রলোভন জয় করার চেষ্টা করছে। ওদের বাড়িতেও দু'চারজন বন্ধুবান্ধব আসে, কৃষ্ণা তাদের সব দেখায়, দুটি ঘর, রান্নাঘর, মায় চায়ের বাসন পর্যন্ত। অনেকদিন অনেক রাত পর্যন্ত তারা থাকে, রণজিতের খাবার উনানে

বসানো থাকে। কখনো দু'চারজন অপরিচিতকে নিয়ে বিভাবতী এসে হাজির হয়, কিছুতেই উঠতে চায় না—রণজিত কাজ থেকে ফিরে এসে অপরিচিতের হাটে ম্লান মুখে বসে থাকে, অনেক পরে তারা যখন উঠে যায়, তখন পবিত্র হিন্দু-হোটেল থেকে খাবার কিনে এনে খেতে হয়। সেদিন রান্না করার সময় হয় নি।

এর পরদিনই ওদের দুজনকেই নিমন্ত্রণ করলো বিভাবতী। কথা প্রসঙ্গে বললো—"এভাবে কৃষ্ণাকে দিনরাত হাঁড়ি-হেসেল নিয়ে আটকে রাখা ঠিক নয়—স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। বিয়েত' অনেকদিন হয়ে গেল এখন মাঝে সাজে একটু বৈচিত্র্য না হলে জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠবে"— ইত্যাদি।

এই সর্বপ্রথম রণজিত জানতে পারলো কৃষ্ণা বহু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে। মনে আনন্দ হ'ল তার, তাই বলল—না কৃষ্ণাকে ত' আমি আটকে রাখিনি, যাবে বৈকি সে সর্বত্র, প্রয়োজন মত যাওয়াই ত' উচিত।

বিভাবতী তখনই বলল—"তাহলে ওকে একটু বুঝিয়ে বোলো।"

কৃষ্ণা ঘরে ঢুকেই বুঝলো রণজিতকে মা কিছু বলেছে। কি করে শেষ পর্যন্ত সব মিটমাট হ'ল তা আমার জানা নেই, রণজিত যদি কলহ সুরু ক'রে থাকে তাহলে বিছানায় শোয়ার পর তার মীমাংসা হয়েছে, ঐ বিরাট খাটটি ওদের পরম-মিত্র। ক্লান্তদেহ একটুতেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সকল কলহের অবসান ঘটে।

বিভাবতী মাঝে মাঝে আমার বাসায় এসে শুনিয়ে যেত কৃষ্ণা এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, "দিনরাত ঐ এঁদো ঘরে, একটা সঙ্গী নেই, কথা বলতে আছে শুধু চাটগার দাশশর্মা গিন্নী। তা অর্ধেক কথাই বোঝা যায় না, কথা কইবে কি!"

আমি জানতে চাই—"তোমাকে কৃষ্ণা এই সব বলছিল নাকি!"

আমার দিকে চকিতে একবার তাকালো বিভাবতী, তারপর বলল—"ঠিক এই সব কথা বলেনি, নিজের মুখে কি আর কেউ নিজের মূর্খামির কথা স্বীকার করে, তবে ওর মুখ চোখের ভাব দেখে তাই মনে হয়।"

কৃষ্ণার ওখানে যখন তখন দু'চারজনকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হ'ত বিভাবতী, আর সেই সঙ্গে কিছু জিনিস-পত্রও দিত, আর কৃষ্ণাও তা অম্লানবদনে গ্রহণ করতো। এই সব বন্ধু-বান্ধবরা নিয়তই পরিবর্তিত হতেন কিন্তু লেগে রইলেন

তরুণ সিনেমা ডাইরেক্টার নিখিল সরকার। তার তোলা 'রক্তের-দান,' 'ভুলের ফসল' ইত্যাদি বই তেমন জমেনি। তবে ছোক্‌রার পয়সা আছে, সে খবর বিভাবতীর অজানা নেই।

সংক্ষেপে, নিখিল সরকার লোকটা সদালাপী, রসিক এবং আনন্দময়। অবশ্য একালে এইসব এমন একটা কিছু বিশেষ সদ্‌গুণ নয়। কৃষ্ণার সঙ্গেও আর সকলের চাইতে এই লোকটির ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বেশী। লোকটি এককালে স্কুলের মাষ্টার ছিল দিল্লী না সিমলায়, তারপর ছবি এঁকেছে, ষ্টুডিয়োতে ঢুকেছিল শিল্প-নির্দেশক হয়ে, এখন ডাইরেক্টার। রীতিমত রোমাণ্টিক টাইপ, মিহিসুরে নানা রকম কৃত্রিম ভঙ্গীতে কথা বলতে পারে, নারীচিত্ত জয় করবার উপযোগী সৎ ও অসৎগুণ দুইই তার আছে। কৃষ্ণাকে একটা জাপানীজ পুড্‌ল কুকুর উপহার দিয়েছে, সময়ে অসময়ে মার্সিডিজ বেন্‌জ হাঁকিয়ে আসছে। কখনো ডায়মণ্ডহারবার কখনো দক্ষিণেশ্বর নিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণাকে।

বিভাবতীর কাছে এ সব জল খাবার, ওদের এই অন্তরঙ্গতার সংবাদ শুধুই যে আমি তা নয়, চেনা-অচেনা যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই শোনাচ্ছে। রণজিত কয়েকবার নিখিল সরকারের নাম শুনেছে, দেখেছে তাকে মাত্র একবার। আমার বিশ্বাস বিভাবতী তাকে বিশদ বিবরণ না দেওয়া পর্যন্ত সে এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেয়নি কখনো। আর পাঁচজনের মতই ভেবেছে।

বিভাবতীর ব্যবহারটা এমনই কুৎসিত হয়ে উঠেছিল এই সময় যে সবকথা ঠিকমত লেখাও সম্ভব নয়। এমনই তার ভাব-ভঙ্গী, যেন এই রোমাণ্টিক নাটকের সে একটা মূল চরিত্র। তাই যা কিছু সে করে সবটাই নাটকীয়। কৃষ্ণার বিবাহটা সে মেনে নিতে পারেনি, তাই তার ধারণা এই বিবাহ ভেঙে যেতে বাধ্য, যেমনই আকস্মিক গতিতে বিয়ে হয়েছে, ভাঙবেও সেই ভাবেই।

বিভাবতীর পরিকল্পনা যদি সব-ঠিক মত চলে তাহ'লে এই বিবাহ ভাঙবে কৃষ্ণার মন যদি রণজিতের উপর থেকে সরে অন্যের ওপর পড়ে। তাই তার এই বিশ্বাস হয়েছে সে বিবাহে ইতিমধ্যেই ভাঙন ধরেছে।

অনেকদিন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে বিভাবতীর মাথায় নাটকীয় সিচুয়েশন খেলে ভালো,—কত কাল্পনিক কথোপকথন সে ঠিক করে রেখেছে, বিশেষত রণজিত সম্পর্কে।

রণজিত যখন এলো তখন আমি বিভাবতীর বাসায় বসে চা খাচ্ছি। রণজিত এসেছিল কৃষ্ণার খোঁজে, সেদিন বুঝি ছুটার বদলে ওদের তিনটেয় কারখানা বন্ধ হয়েছে, বাড়ী ফিরতে দাশশর্মা-গিন্নী খবর দিয়েছেন কৃষ্ণা এখানেই এসেছে।

রণজিত তখনই ফেরবার উপক্রম করছিল, কিন্তু বিভাবতী শাশুড়ীর কর্তব্য হিসাবে এক-কাপ চা না খাইয়ে ওকে ছাড়বে না। আমি বড়ই ক্লান্ত ছিলাম সেদিন, তিনঘণ্টা ধরে এক সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করে একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি। আমার কানে বিভাবতীর নাটকীয় উক্তি আর চোখে ভাস্‌ছে রণজিতের রক্তহীন শাদা মুখ—

"আপনি ঠিক জানেন। ও নিখিল সরকারের সঙ্গে গেছে ?"

"হয়ত গেছে, আমি ত' শুনেছি প্রায়ই যায়।"

কথাটা একেবারে মিথ্যা।—

"কোথায় যায় ?"

"ট্রামে বাসে গিয়ে ধরতে পারবে না, হয় ডায়মণ্ডহারবার নয় দক্ষিণেশ্বর।" বিভাবতীর মুখে কুটিল হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল বিভাবতীর কথায় রণজিত উত্তেজিত হয়ে উঠছে, তাই আমি বল্‌লাম—তবে গেল পাঁচদিনের মধ্যে চারদিন বিকালে সে আমার কাছেই ছিল।

বিভাবতী চটে উঠে আমাকে বল্‌ল—"শঙ্করদা, শাক দিয়ে মাছ ঢেকোনা—" রণজিত উঠে দাঁড়ালো।

"জানো রণজিত দিন রাত ঐটুকু মেয়ে কি রান্না ঘরের কালিঝুলি মেখে বসে থাকৃতে পারে ? এটাও তোমার ভাবা উচিত !"

রণজিত মৃদু গলায় বল্‌ল—"আমি ত' তাকে বেঁধে রাখিনি !"

"তাহ'লে ওকে কিছু বলো না, তোমরা ছেলেমানুষ অল্পতেই খারাপ ভেবে নাও।"

"কিসের খারাপ ?"

"কৃষ্ণাকে তুমি এত বাঁধলে হয়ত ধরে রাখতে পারবে না।"

এইবার রণজিত উত্তেজিত গলায় বল্‌ল—"যা বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন ইঙ্গিত ইশারা ত' অনেক করলেন—"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লাম—"দেখো রণজিত। কৃষ্ণা হয়ত বাড়িতে বসে তোমারই জন্য রান্না করছে। তুমি বৃথা এখানে দাঁড়িয়ে এই সব শুনে মন খারাপ করছ।"

অত্যন্ত গম্ভীর মুখে রণজিত বেরিয়ে চলে গেল। আমার মনে হ'ল বিভাবতীকে দুকথা শুনিয়ে দিই। কিন্তু এমনই আমার দুর্বলতা যে কাউকে মুখের ওপর অপ্রিয় কথা বলতে পারি না। তাই চুপ করে গেলাম, যাই হোক আমিই বা কে! তা ছাড়া আমার কথায় কোনোদিন গুরুত্ব দেয়নি, বিভাবতী।

এদিকে রাত আটটার পর বাসায় ফিরে এসে দেখি দাশশর্মাদের একটা ক্লাস টেনে-পড়া ছেলের হাত দিয়ে এক জরুরী চিঠি পাঠিয়েছে কৃষ্ণা :

"রণজিত এখনও বাড়ি ফেরেনি, দুপুরে একবার এসেছিল, তখন আমি বাড়ি ছিলাম না, তারপরই আর খবর নেই। সেই চারটে থেকে ওর চা জলখাবার নিয়ে বসে আছি, দেখা নেই। মেশোমশাই, বোধহয় একটা কিছু এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে, আপনি একটু পুলিসে খোঁজ করুন।"

আবার ছুটলাম বেলেঘাটা। বেচারী যখন দরজা খুলে দিল তখন সত্যি আমার চোখে জল এল। হয়ত ভেবেছিল রণজিত ফিরেছে। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে উঠেছে, চুল বাঁধেনি, কাপড় ছাড়েনি, মূর্তিমতী আনন্দ প্রতিমা যেন বিষাদ প্রতিমায় রূপান্তরিত : সারা বিকাল থেকে কেবল ঘর আর বার হয়েছে, একবার জানালা একবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমিও এককালে এই বিপদে পড়েছি, তাই ওর মনোভঙ্গী বুঝলাম। পথের পদধ্বনি কি ভাবে এ সময় বুকে বাজে আমি জানি।

রণজিত হতভাগার ওপর ভারী রাগ হ'ল। মনে হ'ল বিভাবতীর কৌশলের ফলে এই মূল্য বার বার দিতে হবে কৃষ্ণাকে। এদিকে আবার রণজিতের যা মেজাজ, ওদের বিয়েটা শেষ পর্যন্ত সত্যি না ভাঙে।

আমাকে এমন চুপচাপ দেখে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরলো কৃষ্ণা, বল্‌লো—"বলুন না মেশোমশাই, আপনি নিশ্চয়ই কিছু জানেন।" বলুন এখনই বলুন।

সব কথা বলা উচিত হবে কিনা ভাবছিলাম, শুধু বল্‌লাম : "এইটুকু জানি, —আজ সন্ধ্যায় রণজিত গোখেল রোডে তোমার খোঁজে গিছল।" তারপর একটু থেমে বল্‌লাম—"তোমার মা হয়ত তাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন।"

কঠোর হয়ে উঠল কৃষ্ণার ভঙ্গী, সে বল্‌ল—"আপনাকে সব খুলে বল্‌তেই হবে, মা কি কি বলেছে বলুন। মা নিশ্চয়ই আজে বাজে কথা বলেছে আবার।"

আমি বল্‌লাম, "সব কথা মনে নেই কৃষ্ণা, আমি হয়ত একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—তবে বোধহয় বল্‌ল তুমি হয়ত নিখিলের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবার গেছ। রণজিত প্রশ্ন করছিল নিখিলের সঙ্গে কৃষ্ণা গেছে আপনি ঠিক জানেন', সেই সময়টা আমি উঠে পড়লুম।"

"বলুন, বলুন—"

"তারপর ও চলে গেল।"

"ঠিক কি কথা হয়েছিল জানেন না? আমি ঠিক কথাটা শুন্‌লে হয়ত একটা ব্যবস্থা করতে পারি?"

"যা মনে ছিল সবই ত' বল্‌লাম।"

কথাটা বোধকরি কৃষ্ণা বিশ্বাস করেনি, আমার মুখপানে অদ্ভুত ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি ধীরে ধীরে বল্‌লামঃ "তোমার মা এখন রণজিতকে ঠিক বুঝতে পারেন নি, মনে হয় এই কথাটা রণজিতকে তোমার বুঝিয়ে বলা উচিত। মাকে আর কি বল্‌বে তুমি?"

"মা? মাকে আমি পাঁচ বছর বয়স থেকেই জেনেছি মেশোমশাই। আমি কড়া কথা বল্‌তে চাই না উনি আমার মা, কিন্তু আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু ওঁকে বিশ্বাস করার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই। উনি আমাকে টাকা দেন, সাড়ি দেন, আমার মা?"

কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর উত্তেজিতও নয়, তেমন শান্তও নয়, কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ। হঠাৎ ওর মার কথা মনে পড়ল, কত ছোট থেকে তাকে জানি, মাত্র এক বছরের এদিক ওদিক। আজ কৃষ্ণার মধ্যে অতীতের সেই বিভাবতীকে যেন দেখতে পেলাম। কি কঠোর তার ভঙ্গী,—মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, নয়নে বিদ্যুৎ বহ্নি। কৃষ্ণা আবার পথের ওপর পদধ্বনি শুন্‌ছে, ভাবছে আমি তাকে লক্ষ্য করছি না, আমিও জানালার ধারে উঠে গিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ দরজায় সামান্য শব্দ হতেই লাফিয়ে দরজা খুল্‌তে গেল কৃষ্ণা। কিন্তু দৌড়ে নীচে না গিয়ে দরজার গোড়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম, কৃষ্ণার রাগ এখনও কমেনি।

আমার কিন্তু রণজিতকে দেখে সব রাগ মন থেকে চলে গেছে। বেচারীকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বেচারী হয়ত কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে, কৃষ্ণাকে হারাবার আতঙ্কে সে প্রায় মৃতকল্প। তারুণ্যের বড় দোষ এই যে সব কিছুই অতিরঞ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, আর আছে আন্তরিকতা,—তার ফলেই ওরা এত কষ্ট পায়।

অনেকক্ষণ দুজনেই নীরবে দাড়িয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ কৃষ্ণা বল্‌ল ঃ "কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?"

"পথে পথে ঘুরছিলাম।" আমাকে দেখে রণজিত লজ্জিত হয়েছে।

কৃষ্ণা বল্‌ল : "আমি আকাশ-পাতাল ভাবছি সেই থেকে।"

"আমারই দোষ।"

"যদি একটা এ্যাকসিডেণ্ট হ'ত। কি মনে হয় বলোত ?"

"সে কথা ভাবিনি,—আমারই অন্যায়।"

"আমার কথাটা তোমার ভাবা উচিত।"

"ভাবছিলাম, সারা সন্ধ্যা ধরেই ত' ভাবছিলাম।"

"আমি শর্মাগিন্নীর মত গরম জলে তোমার ভাতটা রেখে দিয়েছি, এতক্ষণে বোধ হয় অখাদ্য হয়ে গেল।"

"যাক্ গে, আজ আর কিছু খেতে ইচ্ছে নেই।" তারপর বসে রণজিত আবার বলে—"সত্যি, আমি অতি মূর্খ, তোমার দিকে চাই না, এই বাড়ি, না আছে গাড়ি, না আছে টাকা !"

"কে চেয়েছে গাড়ি, বাড়ি ! আমি আর কখনো নিখিলকে এখানে আসতে দেব না !"

"না, না,— তা কোরোনা, আমি একটা স্বার্থপর গাধা হ'তে চাই না।"

"কে বলেছে তুমি গাধা !"

আমি বললাম—"আবার সেই গাধা-প্রসঙ্গ,—এবার তাহ'লে আমাকে ছুটি দাও মা,—তোমাদের দাম্পত্য কলহ মিটুক।"

হঠাৎ রণজিতের পায়ের দিকে তাকিয়ে রোষভরে কৃষ্ণা বল্‌ল : "তুমি যে আবার ভালো জুতোটা পরেছ, ব্যাপার কি ?"

"তোমার জন্যে, গোখেল রোড গেলাম তাই ভালো জুতোটাই পরতে হ'ল।"

"তোমার দেখছি ইনফিরিয়রটি কম্‌প্লেক্‌স্‌ হচ্ছে, ছিঃ ছিঃ মুখটার কাছে বেয়াড়া দাগ করে এনেছ। জানো আর এক জোড়া ভালো জুতো তোমার নেই, কোথায় যেতে অসৃতে দরকার হবে বলে তুলে রেখেছিলাম।"

"বোধ হয় শেয়ালদার কাছে বাস থেকে নামতে গিয়ে হয়েছে। ছি, ছি,।"

"তোমার কোনো কাণ্ড-জ্ঞান নেই, এইটে তোমার ভালো জুতো, আর এত অযত্ন।"

"গেলবারে যখন ব্রাউনটা পরে গোখেল রোডে গিছলাম, তুমি রাগ করেছিলে, বলেছিলে, সবাই হাস্‌বে।"

"আমি অত-শত জানি না, খালি পায়ে থাকলেও তোমার দাম কম্‌বে না। যাকগে, যা হয় করে আমি ঠিক করে নেব'খন।"

এতক্ষণ উঠতে পারছিলাম না, জুতা-প্রসঙ্গ বেশ জমে উঠতে আমি বললাম :

"কৃষ্ণা মা, আমি এরার যাই, এগারোটা বেজে গেছে, এতক্ষণ শুয়ে পড়া উচিত ছিল।"

"মেশোমশাই, আপনি সত্যি 'গ্রেট'—ও আপনি না এলে—"

'গ্রেট' 'আপনি না এলে'—আমি বেচারী এই মধ্যরাত্রে এখন কি করে বাড়ি ফিরি সে কথা ওরা ভাবলো না। অর্ধেক পথ হেঁটে এসে রাসমণি বাজারের কাছে একটা খালি ট্যাক্‌সী কপালে জুটে গেল।

দুদিন পরে বিভাবতী আমাকে আবার বেলেঘাটায় টেনে নিয়ে গেল। রণজিত একা ছিল ওপরের ঘরে, কৃষ্ণা দাশশর্মা গিন্নীর কাছে কি একটা নতুন রান্না শিখতে গেছে। বিভাবতী বোধকরি তার 'পার্ট' মুখস্ত করেই এসেছিল, বলল :

"দেখতে এলাম কৃষ্ণার কাণ্ডকারখানা কতদূর গড়ালো ?"

"কিসের কাণ্ডকারখানা ?"

ঠিক সেই সময় কৃষ্ণাও ঘরে এল, খালি ভ্রূ কুঞ্চিত করে কৃষ্ণাকে সতর্ক করার চেষ্টা করলাম। একবার রণজিত একবার মার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো কৃষ্ণা। রণজিতের ক্রুদ্ধ চোখের চাইতে বিভাবতীর কুটিল দৃষ্টি তার কাছে গভীর অর্থব্যঞ্জক মনে হ'ল।

"মা বুঝি কিছু বলেছে মেশোমশাই ?"

"আমি কি জানি মা; মনে করেছিলাম রণজিত বুঝি সব জানে।"

কি জানি কি ভাবলো কৃষ্ণা, সে হঠাৎ বলে উঠলো—'কি আরম্ভ করেছ মা, কি হয়েছে না হয়েছে আমিই বলছি!'

রণজিত বলল: "কিছু বলতে হবেনা কৃষ্ণা, আমি সত্যি 'ফুল' নই।"

ঘরময় একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া, কিসের যে কাণ্ড আর কারখানা কে জানে! হয়ত সেই নিখিল ঘটিত ব্যাপার। রণজিত এরপর আর দাঁড়ালো না এক মুহূর্ত, তাড়াতাড়ি চলে গেল। শনিবার কাকার বাসায় গিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা করতে হয়, তিনি সেই 'ষ্ট্রোকের' পর আর বাইরে বেরোন না।

রণজিত চলে যাওয়ার পর কয়েক মিনিট কৃষ্ণা শোবার ঘরে বসে রইল, এদিকে বিভাবতী হয়ত তার পরবর্তী পরিকল্পনা মনে মনে চিন্তা করছে।

কৃষ্ণা আত্মস্থ হয়েছে, সে বেশ ঠাণ্ডা গলায় বলল: "তুমি ইচ্ছা করেই এ সব করেছ মা। তোমার নিজের ধারণা মতই কাজ।

কিন্তু সবাইকে নিজের মতো ভেবো না মা। রণজিতকে পেয়ে আমি খুশী হয়েছি। শান্তিতে আছি, তুমি আর আমার সুখের ঘরে আগুন লাগাবার চেষ্টা কোরো না। ওর কাকা শীগগিরই একটা ছোটবাড়ি ও'কে দিয়ে দিচ্ছেন, শ্রাবণের শেষাশেষি আমরা সেখানে যাবো। আমাদের নতুন বাড়িতে তুমি না এলেই আমার শান্তি হবে মা।"

বিভাবতী আহত হয়েছে, কৃষ্ণার গভীর কালো চোখে আগুন জলছে, শান্ত-গলায় বিভাবতী বলল: "তাহলে, তোমার কাছে আসতে আমাকে মানা করছ!"

"উপস্থিত তাই। জানেন মেশোমশাই, রণজিত একবার যদি আমাকে সন্দেহ করতে সুরু করে তাহলেই সর্বনাশ হবে।"

আমি বিভাবতীর মুখের দিকে তাকালাম। তার মুখে কথা নেই, কথা খুঁজছে, পাচ্ছেনা মনে হ'ল। শুকনো মুখে উঠে পড়লো বিভাবতী। দেরাজের গায়ে লম্বা আয়নায় নিজের মুখের পানে ভালো করে তাকাল একবার।

সারাটি পথ একটাও কথা বলেনি বিভাবতী, কিন্তু আমার ফ্লাটে পৌঁছে কাউচে বসেই তার কথার স্রোত বইতে সুরু হ'ল—"জানো শঙ্করদা, সেবার গরমের ছুটিতে কৃষ্ণা বড় দুষ্টুমি করেছিল, তাই বলেছিলাম ছুটি ফুরোনোর

আগেই তুই কন্‌ভেণ্টে ফিরে যা। কি রাগ মেয়ের, পাঁচ মিনিটেই স্যুটকেশ হাতে তৈরী একেবারে, অনেক বুঝিয়ে তবে ঠাণ্ডা করি।"

আবার বলে বিভাবতী : "এখন অবশ্য বোকামি করছে, তবে ও এখনও ছেলেমানুষ, ওর কথা অতটা সিরিয়াসলি নেওয়া ঠিক হবে না। আমি ওকে নেমতন্ন করে আনবো, ভাব দেখাব যেন কিছুই হয়নি।"

"যদি না আসতে চায়।"

"অপেক্ষা করব, ওর চৈতন্য-উদয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকব। জানো শঙ্করদা, মেয়ে হলেও কৃষ্ণা আর আমি দুজনেই বন্ধু। বন্ধুর মতই দেখেছি ওকে, আমাকে সব কথা বলে, আমিও কিছু ঢেকে বলিনা। আমি ওকে সৎ আর নির্ভীক করেই গড়েছি।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললে বিভাবতী, আমি নিঃশব্দে চুরুট টানতে লাগলাম। ভয় ছিল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের বিদ্যুৎলতা এইবার হয়ত কাঁদবে, এই চোখের জল তার সীতা, ষোড়শী, প্রফুল্ল ইত্যাদি নারী-চরিত্রের ছক বাঁধা কান্না নয়, আসল চোখের জল।

এই সময় রাস্তায় কি একটা ঠাকুরের বিসর্জন উপলক্ষ্যে ব্যাণ্ড আর ব্যাগ-পাইপ বাজিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে। বাজনায় ক্রটী আছে, তবু এই সব উত্তেজনাময় পরিবেশ আমার ভালো লাগে। শোনবার জন্য জানলায় দাঁড়ালাম। রাজপথের খারাপ সঙ্গীতও মানুষের কানে মধুর হয়ে বাজে।

বক্ বক্ করছে তখনও বিভাবতী, এখন সে অন্য জগতের মানুষ, তার সব কথা কানে নিইনি।—দেখলাম হাতব্যাগ খুলে আরশি বার করে মুখটা ভালো করে দেখছে বিভাবতী।

বললাম—"কি দেখছ ? পুরানো বিদ্যুৎ আছে কিনা দেখছ ?"

বিভাবতী বলল—"তুমি আবার কৃষ্ণাকে বহ্নি বলতে, ঐকি বহ্নি ও হল তুষারকণা, কিন্তু আমার অনেক কাজ শঙ্করদা, ঐ বোকা মেয়েটার কথায় আর মন খারাপ করবো না। এখনও আমার বয়স আছে। আচ্ছা আমার কত বয়স হয়েছে শঙ্করদা ? তোমার চেয়ে ত' আমি অনেক ছোট !"

দশ বছর কমিয়ে বললাম—"কত আর, এই বত্রিশ তেত্রিশ। দেখায় অনেক কম !"

"তবে কি জানো এখন আমি ক্লান্ত, যখন আনন্দে থাকি তখন মনে হয় বয়স অনেক কম, দুঃখ হ'লেই মনে হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। শঙ্করদা, ষ্টেজ ছেড়ে দেব। মজুমদার মশাই নতুন পার্ট দিতে চান নেবনা মনে করছি,--স্ক্রীনেও ছুটি নেব। এইবার একটা 'আত্ম স্মৃতি' লিখব মনে করছি। ভয় নেই তোমার অন্ন খাবো না, তোমার নামও মেনশন করবো না, কৃষ্ণারও নয়,—নির্বোধ মেয়ে, দেখবে ঠিক বছর খানেক পরে এসে মাফ চাইবে, মাফ করবো, যতই হোক আমারই ত' মেয়ে।"

উঠে পাশের ঘরে গেল বিভাবতী, বোধকরি চুল বা মেকআপ ঠিক করতে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে করুণ গলায় বহু নাটকের নায়িকা বিভাবতী বলল ঃ

"তুমি ছাড়া আমার আপনজন আর কেউ রইলো না শঙ্করদা !"

বাতায়ন

মার কাছে মালতী মাসিমার গল্প দিনরাত শুন্‌তাম। অদ্ভুত সব গল্প, কি বিচিত্র সেই সব কাহিনী, আর আমরা চুপ করে শুনতাম। মাসিমাকে কখনও চোখে দেখিনি, কিন্তু এমনই নিখুঁতভাবে তাঁর গল্প শুনেছি যে মনে হ'ত আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে আছেন।

এমন কি, এই যে 'মালতী মাসিমা' কথাটুকু, তার মধ্যেও যেন কেমন একটা আভিজাত্যের গন্ধ রয়েছে। আমার শিশুমনে মালতী মাসিমা ছিলেন স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, ঐশ্বর্যের মহিমায় মহিয়সী। সব কাহিনীতেই আমার মাসিমা মুক্তহস্তে অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। তাঁর থলিতে খালি টাকা, খুচরো পয়সার বালাই নেই—সবই তিনি দু'হাতে ওড়াতেন।

আমরা অতি দরিদ্র, তাই আমাদেরই কোন আত্মীয় অর্থের প্রতি এমন মমতাহীন, একথা ভাবতেও ভালো লাগে। আমাদের নিদারুণ অর্থাভাব, তাই ভাবতাম এমন প্রচুর টাকা থাকলেই হয়ত আমাদের সব সমস্যা মিটে যেতো।

শীতের দিনে মোটা কাঁথা গায়ে দিয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে মার কোল ঘেঁষে বসে শুনতাম মালতী মাসিমার গল্প আর হাতে টাকা এলে আমরা কি কি করব তার লম্বা ফিরিস্তি। এই শীতকালে মাসিমা হয় ব্যাঙ্গালোর, নয় গোপালপুর-অন-সীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আগে দু একবার বিদেশেও গিয়েছেন।

সেবার শীতের সময় ছিলেন দিল্লীতে। মা বললেন, "মালতী নিশ্চয়ই বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবে, দেখিস তোরা।"

আমি বললাম—"মা, মাসিমা বড়লাটকে বলে আমাদের এই দুঃখ কষ্ট মিটিয়ে দিতে পারেন না ?"

"তা পারে বৈকি ? মালতীর মুখের কথায় কি না হয় ? ওর কথা কেউ ফেলতে পারে না।"

আমি তখন একটু বড় হয়েছি, শুনেছি বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর ভীষণ

মতান্তর চলেছে। তাই বললাম—"মা বড়লাট মালতী মাসির কথা যদি কানে না তোলেন ?"

মা একটু রেগে বলে উঠলেন—"কি যে বলিস, মালতী মাসি স্বর্গে গেলে স্বয়ং যমরাজও দৌড়ে আসবেন।"

এর কিছুদিনের পরেই কুতুব মিনারের ছবি-ছাপা এক পোষ্টকার্ড এল দিল্লী থেকে। তার পিছনে মালতী মাসিমা লিখেছেন মোটা মোটা অক্ষরে—"কাল বড়লাটের বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল।"

মা আমাদের সকলের চোখে যেন আঙ্গুল দিয়েই বললেন ঃ "দেখলি ! কি বলেছিলুম।"

এর পর সপ্তাহের পর সপ্তাহ আবার কাটলো বিরাট প্রাসাদে। সেখানে সবাই কেবল সাটিন আর সিলক পরে। অজস্র খেলনা, চকলেট আর লজেন্‌স্‌ ছড়ানো আছে, যখন খুশি তোলো আর খাও। কল্পলোকে এই কাণ্ড, বাস্তব জগতে কিন্তু কোনোক্রমে ঝোল আর ভাত জুটছে। মনে মনে বলি, 'আর ক'দিন, এইবারই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শীতকাল কেটে গেল। স্কুলে বসন্তকালের কথা শু'ন্‌তে লাগ্‌লাম। বাংলা ক্লাসের পণ্ডিত মশাই বসন্ত ঋতু সম্পর্কে রচনা লিখতে দিলেন। বললেন—এই সময় গাছ, ফুল, পাতা সব ঘুম ভেঙে ওঠে। পাখী ডাকে, ফুল ফোটে ইত্যাদি। ক্লাস ঘরেও ফুলের ছড়াছড়ি, সবাই কিছু না কিছু ফুল হাতে স্কুলে আসে। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়। ভাবি তৃষ্ণাকাতর ফুলের জন্যে বিধাতা এই ফটিক জল পাঠিয়েছেন। ওদিকে করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ লাল শালুর ওপর তুলো লাগিয়ে লিখেছেন "চারিদিকে বসন্ত—টীকা লউন।"

আমরা কিন্তু সেই রকম দরিদ্রই আছি। মাকে একদিন বল্‌লাম ঃ "নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন, না মা ?"

"কি ভুলেছেন ? কে ভুলেছে ? কার কথা বলছিস্‌ খোকা ?"

"মাসিমার যে বড়লাটকে আমাদের জন্য একটু বল্‌বার কথা ছিল। আমাদের কিছু টাকা দেবার কথা !"

"দূর পাগলা, বড়লোকেরা কি গরীবের কথা ভাবে ? স্বয়ং ভগবানই ভাবেন না।"

স্কুলের পাঠ্য হিসাবে মুখস্ত ছিল, তাই আবৃত্তি করলাম ঃ "রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

আমি চিলেকুঠুরীর ঘরে গিয়ে ভগবানকে ডাকৃতে থাকি। মার কথায় আবার ভগবানও যদি চটে যান তাহ'লে আমরা যে গরীব সেই গরীবই রইলাম। স্বর্গ ও নরক পাপ-পুণ্য এইসব নিয়ে আমার মনে চিন্তার আর অবধি ছিল না। যারা সৎ এবং মহৎ তারা থাকবে একদিকে, আর যারা পাপিষ্ঠ তারা নরকে পুড়ে মরবে। আমি থাক্‌বো ভালোর দলে আর মা নরকে পুড়্‌বে, কিন্তু আমি কি করব। কথাটা ভাবতেও খারাপ লাগে। বরং খারাপদের দলে ভিড়ে আমি যদি নরকে যাই আর মার কাছাকাছি থাকি, তা'হলে মা একটু শান্তি পেতে পারেন। মা তবু বুঝবেন মার দুঃখে দুঃখিত হয়েই আমি নরকে এসেছি, তাঁকে আমি ভালোবাসি। হয়ত মালতী মাসিমা কিছু করতে পারেন। —পারেন না ? তাঁকে ত' যমরাজও খাতির করে……

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। পথের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি পড়্‌ছে। কিন্তু ওখানেই বা এত বৃষ্টি কেন, ঐখানে কোনো গাছপালা নেইত'। কিন্তু তখনই মনে হ'ল, পথের চারপাশে কত পোকা-মাকড় রয়েছে। তারা নিশ্চয়ই তৃষ্ণার্ত, বিধাতা তাই হয়তো বৃষ্টি পাঠিয়েছেন। যদি পোকা মাকড়েও তাঁর এত করুণা তাহলে মার হয়ত শাস্তি হবে না।

সেই রাতে মা আবার মালতী মাসিমার গল্প সুরু করলেন ঃ

"কি রূপ, যেন রূপকথার রাজকন্যা। এই পা পর্যন্ত ঘন কালো চুল, কি চোখ! মালতী ঠিক কর্‌ল, এই চুলের কাঁড়ি আর বাড়িয়ে লাভ কি, এইবার একে ছেঁটে 'বব্‌' করে নিই। সব ঠিকঠাক। তারপর কি মনে হ'ল, ওর দাসীটাকে বলল, তুই আগে 'বব' ছেঁটে আয় ত কি রকম দেখায় দেখি। ভারী খামখেয়ালি কিনা, ।ঝকে শেষ পর্যন্ত দশটা টাকা দিয়ে তবে ঠাণ্ডা করে। সে কান্নাকাটি সুরু করেছিল।"

সবাই হাসতে লাগল। আমি কিন্তু সেই হাসিতে যোগ না দিয়ে কেবল ভাবতে থাকি—মালতী মাসিমার কাছে থাকলে কত সহজেই না দশটা টাকা রোজগার করা যেত। শুধু একটু কান্নাকাটি করলেই হ'ল।

মার গল্পেরও শেষ নেই, অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার। মালতী মাসিমার সাড়ি, ব্লাউজ, সিল্‌ক-সাটিন আর অলঙ্কারের হিসাব হচ্ছিল সেদিন। ও সে কি কাণ্ড! কখনো শুনিনি অত জিনিষের নাম এক সঙ্গে। এমন নাকি এক ছড়া হার আছে যার বিনিময়ে একটা ছোটখাটো বাড়ি কেনা যায়। মালতী মাসিমার বাড়িতে আছে চমৎকার বাগান, ফলে-ফুলে ভরা।

গ্রীষ্মকালের জন্য আছে মুসৌরীতে বাংলো। গরমটা সেইখানেই কাটিয়ে দেন।

একবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও নাকি মালতী মাসিমার কাছে এসেছিলেন। ওর ছোট্ট খোকা স্মরজিৎ যখন মারা যায় তখন। শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে দেখা দিয়ে নাকি বলেছিলেন—"আমার ময়ূরপুচ্ছের মুকুট বড় পুরানো হয়েছে, তোর ছেলের চুলগুলো বেশ। ঐ সোনালী চুলের মোহন চূড়া ভারী চমৎকার হবে।" মাসি রাজী হয়ে গেলেন। তার জন্যেই স্মরজিতের মৃত্যুর পরও মালতী মাসিমা শোকে আকুল হয়ে পড়েন নি।

কিন্তু এত শত কাহিনীর ভীড় ঠেলে আমরা মালতী মাসিমার কাছাকাছি পৌঁছতে পারলাম না কিছুতেই।

সেবার দেরাদুন থেকে চিঠি এল, বাড়ীতে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। মা বারবার চিঠিটা পড়তে লাগলেন। আর আমাদের বল্‌তে থাকেন—"তোদের মাসি আস্‌ছে, মালতী আস্‌ছে। আর সঙ্গে আস্‌ছেন সতীনাথ মেশোমশাই।"

দুখানি শোবার ঘর বাড়িতে, সবচেয়ে যেটা বড় এবং ভালো, সেইটি ছেড়ে দেওয়া হবে মাসিমাদের জন্য। ছোট ঘরটায় মা সবাইকে নিয়ে থাকবেন, ওপরের চিলে কুঠুরীতেই শুতে হবে আমাকে।

ভারী রাগ হ'ল আমার, চিলে কুঠুরীতে একটাও জানলা নেই, আছে শুধু 'স্কাইলাইট'। দেয়ালে সব জায়গায় বালি নেই, লোনা লেগে বালি খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। আমি খুঁৎ খুঁৎ করছি। মা শেষকালে চটে উঠে বল্‌লেন—"তুমি বড় হিংসুটে, মালতী মাসিকে কি দেখতে চাস্‌ না?"

আমিও চটে উঠে বল্‌লাম, "চাই না।" এই বলেই ওপরের সেই চিলে কোঠায় গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মনে মনে প্রার্থনা কর্‌লাম, মালতী মাসির যেন আসা না হয়। সবাই হতাশ হোক্‌, জব্দ হোক্‌। মনে পড়ল,

মালতী মাসি বড়লাটের কাছে আমাদের দুঃখের কথা বলেন নি। আর আমরা আজো সেই গরীবই রয়েছি। আমি চিলেকুঠুরীতে মরে পড়ে থাক্‌বো, আর শ্রীকৃষ্ণ এসে মাকে বল্‌বেন, আমাকে তাঁর চাই। কারণ স্বর্গে……তখন হঠাৎ মনে পড়ল, আমার ত' সোনালী চুল নেই। বেশ ত' মালতী মাসিমা এলে তাঁকে দিয়েই করিয়ে নেব। একটু কান্নাকাটি করলেই ত' দশটা টাকা পাচ্ছি। সেই টাকায় চুলটা সোনালী রঙে রাঙিয়ে নেব। তখন আমার কথা মনে করে সকলে কাঁদবে, দুঃখ করবে। শ্রীকৃষ্ণ এসে বলবেন, কি করবো বলো আমার যে সোনালী চুলের দরকার—।

আমার ছোটবোন নিন্‌নিটা আবার না বলে দেয় যে আমার রঙকরা চুল। প্রবল ক্ষিধে পেয়েছিল, তাই অতি উদার মনে মা এবং আর সকলকে ক্ষমা করে নিচে নেমে গেলাম একটু চায়ের লোভে।

চা খেয়ে আবার ওপরে উঠলাম, হঠাৎ মনে হ'ল নাইবা থাক্‌লো জানলা। জানলা একটা তৈরী করতে কতক্ষণ। সিঁড়ির তলাকার খুদে ঘরটায় কিছু রঙ পড়েছিল, সেই রঙ নিয়ে এসে কুঠুরীতে জানলা আঁকতে সুরু করলাম—জানলা তৈরী শেষ হলে বুঝলাম আর একটা জিনিষের অভাব রয়েছে, জানলা দিয়ে কিছু একটা দেখা দরকার। তাই তার ওপর ফুল এঁকে দিলাম। তারপর বড় খুকীর একটা পুরানো ফ্রক ছিঁড়ে নিয়ে পরদা খাটিয়ে দিলাম। খুব ভালো লাগল। বিছানায় বসে মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলাম। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে কেমন দেখাবে কে জানে ?

আমার ছোট বোন নিন্‌নি কিন্তু এক ফাঁকে এসে দেখে গিয়ে নীচের সবাইকে খবরটা জানিয়ে দিল।

মা বললেন ঃ "আচ্ছা পাগল ছেলে ত' ?"

কিন্তু নিন্‌নিটার বুদ্ধি আছে, বলল, "ঐতেই যদি ও খুশী থাকে তোমাদের কি মা !"

মনে মনে নিন্‌নিকে ধন্যবাদ দিলাম।

অবশেষে একদিন মালতী মাসিমা এসে পৌঁছলেন। চমৎকার তাঁর চেহারা, কি রূপ, কি গড়ন। কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ কেশ। অনেক কথা বলেন দিনরাত। কথায় একটু টান আছে। যা বলতেন, তাই ভালো

লাগত। কেবলই মনে হ'ত ওঁর বুকে যদি একটু ঠাঁই পাই। কিন্তু ভারী লাজুক ছিলাম, তাই তাঁর সেই বিচিত্র গণ্ডীর বাহিরেই রয়ে গেলাম।

সীতানাথ মেশোমশাই মানুষটি আমার মত, লক্ষ্য করলাম, মাসি কাছে থাকলে বড় কথা বলেন না। শুধু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সোনার হাত ঘড়িতে দম দেন, আর মাঝে মাঝে সিগারেট টানেন। অর্ধেকটা থাকতেই ফেলে দেন। আমি সেই আধপোড়ো সিগারেট, খালি দেশলাই-এর বাক্স আর রাঙতা কুড়িয়ে ওপরের ঘরে রেখে দিই। মনে মনে স্বপ্ন দেখি যেন মালতী মাসিমার মত বড়লোক হয়ে গেছি।

এক সন্ধ্যায় আমাদের সকলকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে গেলেন মাসিমারা। ভেল্ভেট মোড়া সেই সব চেয়ার আমার মালতী মাসির চাইতে সুন্দর নয়। সবই যেন তাঁর, থিয়েটারের বাড়িটাও। ষ্টেজের ওপর একটা লোক ইনিয়ে বিনিয়ে গান সুরু করলো। দেখি মালতী মাসিমার চোখে জল। কি সুন্দর রুমাল, রঙীন লেশের পাড় বসানো চারধারে। মাসিমার কান্না দেখে আমারও কাঁদতে ইচ্ছে করে। বোধকরি বুঝতে পেরেছিলেন, আমার হাতে একটা চকলেট গুঁজে দিলেন তাড়াতাড়ি। ইতিমধ্যে থিয়েটারের সবাই হাততালি দিয়ে উঠল, কারণ ষ্টেজের লোকটার গান শেষ হয়েছে। আমার মনে হ'ল লোকটা যদি আবার গান গায় ত' বেশ হয়। তা'হলে মাসিমা আবার কাঁদবেন। কিন্তু আর হ'ল না। একদল মেয়ে লাইন বেঁধে নাচতে নাচতে এসে দাঁড়ালো, তারপর সবাই কোরাস গান ধরলো।

সবাই হাস্‌ছে। মাসিমাও হাসতে থাকেন। মার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন "দিদি, সেই নেপা বোসের নাচ মনে আছে ?"

তারপর সেইখানে বসেই বাল্যকাহিনী সুরু হ'ল। থিয়েটার ভাঙবার পর মেশোমশাই আমাদের একটা কাফেতে নিয়ে চা এবং কেক খাওয়ালেন। যে ছেলেটা আমাদের পরিবেশন করছিল, লক্ষ্য করলাম মাসিমা তাকে একটাকা বকশিশ দিলেন। একটা ট্যাকসী নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম—অন্ধকার পথে আমার হাতটা মাসিমার হাতের মুঠোয় ধরা রইলো সারাক্ষণ। কিন্তু কেউ জানতে পারলো না, মা পর্যন্ত না। আমাকে বললেন—হাসির গানটা ত' গুন্ গুন্ করে গাইছিলি, এখন গলা ছেড়ে ধর দোখ !

লজ্জায় চুপ করে রইলাম। মাসিমা নিজেই গাইতে সুরু করলেন, তারপর

মাঝপথে থেমে হাসতে লাগলেন। এমন মধুর গলা, যেন পিয়ানো বাজছে,— আমার যদি ক্ষমতা থাকৃতো, ওঁকে কাছে বসিয়ে সারাক্ষণ ঐ হাসি শুনৃতাম।

কিন্তু ওঁদের আবার ফিরে যাওয়ার সময় হ'ল, একদিন সতীনাথ মেশোমশাই আর মাসিমা দেরাদুনের পথে পাড়ি দিলেন। ষ্টেশনে একটা পাঁচ টাকার নোট হাতে দিয়ে মাসিমা আমাকে চুমু খেলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ঐ নোটখানি তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রেখে দেব চিরকাল। বাড়ি ফিরতেই মা সেটি কেড়ে নিয়ে একটা আধুলি হাতে দিয়ে বললেন—"মাসি এখানে থাকলে আদর দিয়ে তোমার মাথাটি চিবিয়ে খেতেন।"

আবার সেই পুরাতন শোবার ঘরে সবাই ফিরে এসেছি। সারা বাড়িটা মাসিমার শোকে যেন মুহ্যমান। রাতে বিছানায় শুয়ে মনে হয় সারা বাড়িটা যেন কাঁদছে। আবার সেই পুরাতন খাদ্য, অর্থাৎ ঝোল এবং ভাত। পাওনাদাররা বাড়িতে এসে হানা দেয় আর মার নির্দেশ মত আমরা বলি—"মা বাড়ি নেই।"

শরৎকাল। সামনে পূজো, আমাদের একমাত্র আশা। মা অতীতে তাঁদের দিনাজপুরে কি ধরনের দুর্গাপূজা হত তার কাহিনী শোনান। কি সব দিন গিয়েছে। পূজোর সময় দাদামশাই অনেক খরচ করতেন, সবাইকে কাপড় জামা দিতেন।

মা বলতেন—এ বছর পূজোয় আমি একটা কাণ্ড করবো, যা থাকে কপালে, এবার যা করবো কখনো তা হয় নি। সেই রাত্রে আমি পরমানন্দে ঘুমিয়ে পড়লাম, এবার পূজায় আনন্দের স্বাদ মিলবে।

কিন্তু যখন পূজো এল, সবই বানচাল হয়ে গেল, আমরা গভীর হতাশায় পড়লাম। যা কিছু পরিকল্পনা সব ফেঁসে গেল। যে টাকা পাওয়া যাবে আশা ছিল তা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। মার মনে কষ্ট হয়েছে বুঝলাম, তাই আমিও এমন ভান করলাম যে, এবার পূজায় আমরা খুব খুশী হয়েছি। আমার আনন্দ দেখে মা ভাবলেন হয়ত তাঁর সব প্রতিশ্রুতি আমি বিস্মৃত হয়েছি। মা পরবর্তী বছরের পূজার কথা বললেন, প্রতিজ্ঞা করলেন আসছে বছর কিছুতেই নড়চড় করবেন না কথার, যে করে হোক ভালো জামা জুতো কিনে দেবেনই। আমিও তা বিশ্বাস করি, কারণ আগামী পূজার তখনও এক বছর দেরি।

কিন্তু এক বছর কাটার আগেই আমার মত পরিবর্তিত হ'ল। শীত প্রায় কেটে গেছে। গাছ-পালায় নতুন রঙ ধরেছে, পাতায় লেগেছে রোদের সোনালী রঙ। রাতে বেশ ঠাণ্ডা, আমরা সব দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরের ভেতর চুপ করে বসে থাকি।

এমনই একদিন রাতে দরজায় প্রচণ্ড ঘা পড়লো—

মা বললেন "কে রে বাবা,—এত জোরেই বা ধাক্কা কেন?" আমার ছোট বোন নিন্‌নি উঠে দরজা খুলতে গেল। মা আমাদের সকলের মুখের পানে সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে একে একে তাকালেন, যদি আমরা কিছু বল্‌তে পারি। নিন্‌নি ফিরে এল। বল্‌ল ঃ "পুলিস এসেছে মা! তোমাকেই ডাক্‌ছে।"

সহসা সবাই ভয়ে অস্থির।

মা উঠে গেলেন। শুন্‌তে পেলাম, মা বলছেন—'হ্যাঁ, আমার নামই বটে, ভেতরে আসুন।"

পুলিসের লোকটি ভেতরে এলেন—বললেন ঃ "দেরাহুনে আপনার কোন বোন আছেন, মালতী চৌধুরী?"

"হ্যাঁ, কি হয়েছে বলুন?"

'খারাপ খবর!"

মা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন কি মনে করার চেষ্টা করছেন। এই ভাবেই তিনি থাকতেন, যখন কি বল্‌বেন তা মনে পড়তো না।

"খারাপ খবর!" পুলিসের লোকটি এই বলে আমাদের সকলের দিকে একবার তাকাল্লেন। যেন আমরা সব জানি।

"আপনার বোনটি মারা গেছেন।"

নোটবই খুলে পুলিসের লোকটি বললেন ঃ "এখানে টেলিগ্রাম এসেছে, ওখানে লেকের জলে আজ সকালে তাঁর দেহ পাওয়া গিয়াছে।"

মার চোখে জল। "মা ল তী!" বলে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আমার চোখেও লেকের সমস্ত জল যেন এসে জমেছে।

"আপনাকে অবশ্য সনাক্ত করতে হবে না, তাঁর স্বামী সে কাজ করেছেন..."

"সীতানাথ!"

'না না, জয়পাল সিং।"

চারিদিক নিস্তব্ধ, শুধু দেওয়াল ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে চলেছে।

"আচ্ছা নমস্কার !"

মা তাঁকে দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

মা ফিরে এসে আর কথা বলেন না। একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, আমরাও সেই শোকের অংশ নিলুম। কি বিশ্রী রাত! বিছানায় শুয়ে বার বার মালতী মাসিমাকে স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই মনে এল না তাঁর মুখ।

মা দেরাদুন রওনা হলেন।

ক'দিন পরে ফিরে এসে মাসিমার সব খবর বল্‌লেন।

কত লোক, কত ফুল, সারা দেরাদুনের লোক নাকি সেই শোকযাত্রায় ভেঙে পড়েছিল, তাদের চোখের জল বৃষ্টি ধারার মত বইছে।

আমি বল্‌লাম : "সীতানাথ মেশোমশাই কাঁদ্‌ছিলেন ?"

মা বিরক্ত হয়ে বললেন—"অত আজেবাজে বোকো না।"

নিন্‌নি বললে—"তিনি ত' জেলে—"

মা চটে উঠে বল্‌লেন—"নিন্‌নি চুপ কর বল্‌ছি, বড় কথা শিখেছিস্, না ?"

নিন্‌নিও ছাড়বার পাত্রী নয়, বল্‌ল :—বারে! এ ত' সত্যি কথা! তুমিই ত' বল্‌ছিলে !"

"আর কখনও যদি তোকে কিছু বলি, খুব মেয়ে তৈরী হয়েছিস্, বাবা !"

"আচ্ছা! আচ্ছা! আর কিছু বল্‌বো না, এবার বলো।"

আমি প্রশ্ন কর্‌লাম, "কেন জেল হয়েছে মা ?"

মা বললেন : "টাকার জন্যই সব। পরের জিনিষ না বলে নিলে তোমাকেও একদিন সেইখানে যেতে হবে।"

"কিন্তু মালতী মাসিমা কি দুঃখে মারা গেলেন মা ?"

নিন্‌নি বলে ওঠে—"নিজেই জলে ডুবে মারা গেছেন।"

"না কখ্‌খনো নয়।"

নিন্‌নি আশ্চর্য হয়ে বলে—"বলো কি মা! নিজে ইচ্ছে করে ডোবেন নি ?" মা এতক্ষণে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

নিন্‌নি চুপি চুপি বললে : "জানিস্ দাদা, গলায় নাকি সেই দামী হারটা ছিল।"

আমি কাঁদতে কাঁদতে চিলে-কুঠুরীতে উঠে গেলাম। মালতী মাসিমার সাড়ি জলে ভিজে কি রকম হয়েছে যেন কল্পনানেত্রে দেখতে পাচ্ছি।

যদি নিজেই মারা গিয়ে থাকেন তাহলে ত স্বর্গে যেতে পাবেন না। যমদূতরা পথ আট্‌কে দাঁড়াবে। ভিজে সাড়ি আর খোলা চুলে মাসিমাকে বরাবরই অমনতরো দেখতে। মনে করবে উনি কুৎসিৎ ও দুষ্টু স্ত্রীলোক। সোজা নরকের পথ দেখিয়ে দেবে। বিধাতার চুলচিরে হিসাব-করা বিচারব্যবস্থার কথা ভেবে মনে মনে রাগ হয়, মাসিমার চুল, সাড়ি শুকিয়ে নেওয়ার একটু সময় দিলে তো তিনি বুঝতেন ওঁর আসল রূপ। আমার মনে হ'ল, মাসিমাকে যদি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়, তাহ'লে বুঝবো বিধাতার করুণা নেই। তাঁর প্রিয়জন কেউ কষ্টে পড়ে দুঃখ পেলে হয়ত তাঁকে আমাদের মত কাঁদতে হয় না।

দেওয়ালের গায়ে আঁকা আমার সেই জানলাটি চোখে পড়লো। এর মধ্যেই কত বিবর্ণ হয়ে এসেছে। যেন ছোটোবেলার কোনও ক্ষীণ স্মৃতি-রেখা। এই কাণ্ডটা অবশ্য ছেলেমানুষী, নিছক বোকামী। কোনোদিনই ওটা প্রকৃত জানলা হবে না, কোনোদিন কিছু দেখা যাবে না ঐ জানালায়। যেসব গাছপালা আর আকাশ ওর ভিতর দিয়ে দেখবো মনে করেছিলাম আমার জীবনের পূজার আনন্দ-উৎসবের মত কোনোদিনই তাকে নিবিড় করে পাবো না।

টেবিলের ওপর একটা টুল রেখে উঠে দাঁড়ালুম—স্কাইলাইটটা বন্ধ ছিল, টেনে তাকে খুলে ফেল্‌লাম, বাইরে নূতন জগৎ। শুধু ছাদ আর ছাদ, ছোট-বড় নানা বাড়ির নানা ধরনের ছাদ। কিন্তু গাছ, পাতা, ফুলের চাইতে তাদের বাহার কম নয়।

দীর্ঘক্ষণ ঐ ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নানা ধরনের ছাদ, আর কারখানার চিমনি। হঠাৎ ভীষণ কান্না পেল আমার। মালতী মাসিমা আর কোনোদিন এই বিচিত্র লোক দেখতে পাবেন না, অথচ আমার পক্ষে কত-সহজ কত সাধারণ কর্ম, যখনই খুশি এই ভাবে উঠে দেখতে পাবো।

নীচে নেমে নিজের আঁকা জানলার দিকে তাকালাম না,—মালতী মাসিমার

মতো ওরও কোনো অস্তিত্ব নেই। এখন আমি নতুন ভুবনের সন্ধান পেয়েছি —ছাদ আর কারখানার চিম্‌নি।

এর কিছুকাল পরেই ঐ বাড়ি আমাদের ছাড়তে হয়েছে। মাঝে মাঝে ভাবি, নতুন ভাড়াটেরা চিলেঘরের দেওয়ালে আমার হাতে আঁকা জানলাটা দেখে কি মনে করছে। হয়ত মুছেই ফেলেছে দেওয়ালে চুনকাম করে।

বিরহ মিলন কথা

আগেও ওদের দেখা শোনা হয়েছিল। এই পৃথিবীতে আসার কিছুকাল আগে কুণাল আর যমুনার হঠাৎ দেখা হয়ে গিছ্‌ল।

কাহিনীটা বরং গোড়া থেকেই বলি ঃ

কুণালের মার বিয়ে হয়েছিল প্রায় বছর ষোলো আগে, অথচ ছেলেপুলে নেই। সন্তানের জন্য তাঁর প্রাণে আকুলতা অসীম। পুত্র কামনায় পূজা উপবাস, মানত আর মাদুলীর শেষ নেই। দিনরাত এই তাঁর চিন্তা।

তাই এতদিনে জাত, বর্ণ, স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদির গণ্ডী অতিক্রম করে রক্ত মাংসের আকার নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসার সময় হয়েছে কুণালের। এই বাংলা দেশে বাঙালী হয়েই জন্মানোর কথা। যাঁরা একদা সে দেশের জীবন-নাট্যে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাছেই সে বাংলার খবরাখবর জানার চেষ্টা করে, বাংলা মুলুকের হালচাল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য তার আগ্রহ অসীম।

এই স্তরে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে পনের বছর কেটেছে। আশ্চর্য। সে যে কে, কোথায় ছিল আগে, কিছুই তার স্মরণ নেই। তার জন্য মনে একটা অশান্তি আছে। একজনকে প্রশ্ন করেছিল, তিনি বললেন ঃ—হয়ত জন্মানোর সঙ্গেই মৃত্যু ঘটেছে, তাই কিছু স্মরণ করতে পারছ না। ওরকম হয়। তবে আমি হলে, এ নিয়ে মাথা ঘামাতাম না।

জন্ম রহস্য নিয়ে কিন্তু কেউ কিছু বলতে চায় না,—অদ্ভুত তাদের ধারণা।

কুণাল একজন জ্ঞানীকে প্রশ্ন করে—"এ সব তত্ত্ব না জানাটাও অতি-আশ্চর্য। আমি কোনদিন জন্ম রহস্য চিন্তা করিনি, কিন্তু এখন ত' দেখছি আবার জন্মাতে হবে, হয়ত যে কোনদিন আমাকে চলে যেতে হবে,—আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে এখানে আর বেশী দিন থাকতে পাব না। কেন যে এমন মনে হচ্ছে তা অবশ্য বলতে পারি না,—আচ্ছা জীবন্ত মানুষগুলো অমন ছায়ামূর্তির মত মনে হয় কেন? আমি যখন ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াই ওা তেই পারে না। আপনার কি মনে হয়?"

জ্ঞানী হেসে বললেন—"দেখ আমি ত' আর ফিরে যাইনি, আমি বেশী কিছু জানি না। তবু আমার মনে হয় তোমাকে টান্‌ছে, কেউ ডাক্‌ছে,—তারপর ত্ব'বছর বয়স হওয়ার আগে তুমি কিছুই টের পাবে না। সোজা ব্যাপার। ভয় পাওয়ার কি আছে ?"

কুণাল বলে—"আমার এখানেই বেশ লাগছিল, জন্মানোর তেমন ইচ্ছে নেই।"

জ্ঞানী অট্টহাস্য করে বল্‌লেন: "ভায়া হে! এ ব্যাপারে তোমার ইচ্ছে অনিচ্ছে খাট্‌বে না, একদিন আমাকেই এই খোলটা ফেলে আবার হামাগুড়ি দিতে হবে। সেইদিন তোমার মত আমাকেও এমনই তৈরী হ'তে হবে।"

কুণাল বল্‌ল: "বাঙালী হয়ে জন্মাতে হবে, তাদের খবর জানার জন্যই আগ্রহ! ভালো কথা মনে পড়েছে হিমালয় অঞ্চলে একজন বাঙালী লেখক আছেন, বাঙালী সমাজ তাঁর পরিচিত। আশা করি তাঁর কাছে কিছু শোনা যাবে। কি জানেন, অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে ভয় করে, অজানাকেই আমার ভয়।

জ্ঞানী প্রসন্ন মনে আশীর্বাদ করলেন—"মঙ্গল হোক তোমার, যা অজানা তা অজেয় নয়, নির্বিঘ্নে ফিরে এসো আবার।"

বাংলার কথা শুনবে বলে কুণাল বাঙালী সাহিত্যিকের সন্ধানে চলেছে। তখন সবে বসন্তের সুরু। ফুলে আর নতুন পাতায় চারিদিক ছেয়ে আছে। হিমালয়ের চূড়ায় বরফ জমে আছে—নদীর জল পরিষ্কার এবং শান্ত।

এখন পথ চলতে তার কষ্ট হয়। আগের মত সেই স্বচ্ছন্দ গতি আর নেই। এখন থেকে জীবন্ত মানুষের মত ওকেও হাঁট্‌তে হবে।

সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি চুপ করে বসেছিলেন। কুণাল গিয়ে দাঁড়াতেই, বল্‌লেন: "কি খবর? ডাক পড়েছে বুঝি? আমাদের আর এক বন্ধুও যাবেন, তিনি ত' রেগে অস্থির! দুপুরের পর দেখি আকারও বদ্‌লেছে অনেক।"

কুণাল প্রণাম করলো সাহিত্যিককে। তিনি বেশ আনন্দেই আছেন। বল্‌লেন—অনির্বচনীয়ের ধ্যান করে—দিনগুলো বেশ কাট্‌ছে হে, তবে পূর্বজীবনের কথা একরকম ভুলতেই বসেছি,—ছোট খাটো কথা মনে নেই। কি লিখেছি না লিখেছি তাও ভুলে যাব।"

অনেক কথার পর প্রায় সন্ধ্যার দিকে কুণাল সাহিত্যিককে প্রণাম করে আরো এগিয়ে চল্‌ল পাহাড়ী গ্রামের দিকে। পাহাড়ের চূড়ায় রোদের সোনা ঠিক্‌রে পড়্‌ছে, নীচে ধোঁয়া আর কুয়াশার ছায়া।

পার্বত্য নদী পার হয়ে—ওপারে পৌঁছল, সামনেই একটি গ্রাম্য মন্দির পাহাড়িয়ারা পূজা করে, মন্দিরের চূড়ায় লাল নিশান।

অদূরে পাহাড়ের গায়ে ফুটেছে অসংখ্য বনফুল। কত গোলাপ, কত পিটুনিয়া, ফুলের কি বিচিত্র সমারোহ, যেন ফুলের প্লাবন।

কুণাল ফুলের সেই ঝোপ ভেদ করে চলে, কত ফুলের কুঁড়ি তার গায়ে এসে পড়ে। বাতাস মধুগন্ধে ভরা। নীচু হয়ে বসে ঘাসগুলি দুহাতে অতি লঘুভাবে স্পর্শ করে কুণাল, তারপর সেখানেই শুয়ে পড়ল। চোখের ওপর তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের চূড়া ভাস্‌ছে—হাওয়ার গতি অতি মৃদু। সেইখানেই চুপ করে শুয়ে থাকে কুণাল। অনেক পরে ছাগলের গলার ঘণ্টার মৃদু আওয়াজে সচকিত হয়ে দেখে বুনো রাখালরা ফিরছে।

ঠিক সেই সময়েই যমুনার সঙ্গে দেখা।

ফুলের ভেতর দিয়েই সে এসেছে, ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে আস্‌ছে, কার জন্য এই পুষ্প চয়ন, কার পূজার সাজি ভরেছে কে জানে।

কুণাল বোঝে মেয়েটিও জীবিতলোকের নয়, তাহ'লে অমন স্পষ্ট ওকে দেখা যেত না,—ওর মত মেয়েটিরও পৃথিবীতে ফেরার সময় আসন্ন, তাই মাটিতে পায়ের ছোঁয়া লাগ্‌ছে। মেয়েটির গতিভংগী কেমন যেন অস্বচ্ছন্দ অনিশ্চিন্ত। এই প্রথম যেন সে দেহভার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে।

কুণাল শ্বাস বন্ধ করে শুয়ে ওকে দেখে।

মেয়েটি সুন্দরী বটে। এমনটি আর সে দেখেনি। কেমন সুসংবদ্ধ তার দেহভঙ্গিমা, মুখটিও তেমনই সুষমামণ্ডিত।

পাছে মেয়েটি ওকে দেখে ভয় পায় তাই সহসা উঠে বসে কুণাল—আর ঠিক সামনেই ভীতচকিত হরিণীর মত মেয়েটি দাঁড়িয়ে।

কুণাল বলে—আমি কিন্তু আপনাকে ভয় দেখাবার জন্য এখানে বসে নেই।

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসে বল্‌লে—এই স্তরটায় আপনিও থাকেন নাকি?

—এটা বুঝি আপনার এলাকা?

—প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরে রোজই আসি, আজই প্রথম আপনাকে দেখছি—

—আমি না হয় চলে্ই যাচ্ছি, আমি জানতাম না।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি ওর কাছে এসে পাশের জায়গাটিতে ঘাসের ওপর বসে পড়ল, তারপর বল্‌ল—না না, যাবেন না···কতদিন সঙ্গ পরশ হারা হয়ে আছি, তবু ত' আজ আপনাকে পেলাম। ইদানীং কেমন যেন সব ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে। কেউই আর কথা বলে না, অনেকে যেন আমাকে দেখতেই পায় না, একটু আগে ছাগলগুলোর সঙ্গে কথা বল্‌ছিলাম। ওরা আর কি বোঝে ?

কুণাল বল্‌ল—বেশত, আমি আছি।

এই ভাবেই পৃথিবীতে আসার কিছু আগেই কুণাল আর যমুনার দেখা হয়েছিল।

যমুনার মা থাক্‌তেন দিল্লীতে। এই কিছুদিন হ'ল বিয়ে হয়েছে, একটি মেয়ে—বেশ ডাগর চোখ ওলা ফুটফুটে মেয়ের জন্য তাঁর মন কাঁদছে। যমুনার মা প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, তার সব কাজ নির্ভুল, নির্ভেজাল। বংশ মর্যাদার বাতিকও তার কম নয়। তাই বেচারী যমুনা রীতিমত বনেদী বাড়ির মেয়ের মত তৈরী হচ্ছে। যমুনা বলে—যেখানে যেখানে পূর্ব পুরুষদের দেখা পেয়েছি, তাঁদের কাছে বংশের ইতিকথা শুনেছি, ভাদুড়ী বাড়ির মেয়ে হতে হলে কি কি গুণের প্রয়োজন তার লম্বা ফিরিস্তি সবাই শুনিয়ে দিয়েছেন।

এই পর্যন্ত বলে চোখে হাত চাপা দেয় যমুনা, তারপর আবার বলে কি যে কাণ্ড হ'বে তা জানি না। আপনাকে সব বলে ফেললাম, বলা নাকি ঠিক নয়।

—কার কাছে এ সব শুন্‌লেন ?

—বদরিকাশ্রমের ধারে আছেন আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, তিনি আমাকে দেখেই চিনেছেন, বললেন, নিশ্চয়ই—যমুনা, ভাদুড়ীদের বাড়ীর মেয়ে—দেখ্‌লেই চেনা যায়।' এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি কুণালকে প্রশ্ন করে—কিন্তু আপনার নাম ? কোথায় যেতে হবে আপনাকে ?

—ঠিক জানি না। তবে শুনছি নাকি কল্‌কাতায়! এক রকম ভালোই হয়েছে, আমিও মনে প্রাণে বাঙালী হতেই চেয়েছি, বাঙালীর ইতিহাস আমার মুখস্থ।

যমুনা মাথাটা বাতাসের তালে দোলায়। তার চারপাশে ফুলের বন্যা চুলগুলি হাওয়ায় উড়ছে! কুণালের মনে আগুন জ্বলে উঠে, তার সারা দেহ মনে এ কিসের উত্তাপ। যমুনাকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে বাসনা হয়। এতই গভীর সে আবেগ—যে কুণালের চোখেও মনের ছায়া পড়ল।

যমুনা চুপ করে কুণালের মুখের দিকে চেয়ে আছে, তারপর সহসা দুহাত দিয়ে কুণালের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে, —তারপর কুণালের মুখটি চুমায় চুমায় ভরিয়ে দেয়। শীতল ঠোঁট দুটি মধুর চুম্বনের উষ্ণ আবেশে অবশ হয়ে পড়ে। বিহ্বল কুণাল চোখ দুটি বুজে চুপ করে পড়ে আছে।

অনেক পরে কুণাল বলে—জানতাম, এমনটি হবে জানতাম। তোমাকে দেখেই একথা মনে হয়েছিল আমার।

—কিন্তু এ ত' ক্ষণিকের স্বপ্ন। মরিচিকা মায়া।

—না, এ ক্ষণিকের স্বপ্ন,—এই স্বপ্ন চিরন্তন। হাজার হাজার বছর ধরে এই চিরন্তন ধারা চলেছে, কার সাধ্য সে ধারা রোধ করে।

কয়েকটি চমৎকার দিন এই ভাবে কাট্‌ল। সেই শৈল-সানুতে বসন্ত এসেছে, ফুলে ফুলে বনভূমি বিবশ, পাখিরা উড়ে চলেছে কোন মানসের সন্ধানে।

যমুনা আর কুণাল হাত ধরাধরি করে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়—পাহাড় নদী, অরণ্য—সর্বত্র তাদের অবাধ গতিবিধি। এই ছায়াপথের রাজ্যে ওরা দুজনে অনির্বচনীয় আনন্দে বিচরণশীল।

এদিকে যমুনার মার মর্তলোকে সন্তান সম্ভবান হ'ল। যমুনা আস্‌ছে, আর বাংলাদেশের এক সহরে কুণালের মা প্রতীক্ষা করে আছেন কুণালের ভূমিষ্ঠ হওয়ার শুভক্ষণটির পরম মুহূর্তের জন্য।

যমুনা মনটাকে খুশী রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু একা থাকার ভয়ে সে আতঙ্কিত হয়ে আছে। সে বলে "তুমি যদি আগে গিয়ে জন্ম নাও আমার কি হবে? আমি কোথায় থাক্‌বো, কি করে তোমার সন্ধান পাবো? তুমিই বা কি করে আমার সন্ধান পাবে!"

"নিশ্চয়ই আমরা একটা সন্ধান পাব,—যত দূরেই থাকি আর যেখানেই থাকি, দেখা আমাদের হবেই। কেউ আমাদের বাঁধতে পারবে না। আমার কথা চিন্তা কর্‌তে করতেই জন্ম নিও। আবার একদিন আমরা এই প্রান্তরে, এই ফুলের

রাজ্যে এমনই এসে মিল্‌বো। আমাদের এই প্রেম চিরন্তন। চিরন্তন প্রেমের বিনাশ নেই। জীবনে আমাদের প্রেমবন্ধন অটুট—মরণেও। কি যমুনা, ভয় করছে?"

"না, না, ভয় নয়, কিন্তু কি জানো, সব কিছু জানতে ইচ্ছে করছে। ভবিষ্যতটা স্পষ্ট করে দেখতে চাই। ওরা আমাদের বুঝিয়ে দেয় না কেন? কি বলতে চায় ওরা স্পষ্ট বলুক।"

"একদিন বুঝবে, একদিন ওরা বল্‌বে।"

যমুনা ওর বুকের উপর মাথটি রেখে চুপ করে শুয়ে থাকে। কুণালের হাত দুটি আকুল আবেগে বেঁধেছে যমুনাকে। সহসা মাথা তুলে কুণাল বল্‌ল :—

"শুনতে পাচ্ছ, কে যেন ডাক্‌ছে?"

"না,"

"নারীকণ্ঠ! করুণ কণ্ঠস্বর!"

"না"

তখনও যমুনাকে ধরে আছে কুণাল—আবার সে সভয়ে বলে ওঠে—ঐ শোনো, আবার শোনা যাচ্ছে। যমুনার বাহুপাশ থেকে তাড়াতাড়ি আপনাকে মুক্ত করে নেয় কুণাল।

"কে আমাকে ডাক্‌ছে, যেতে হবে আমাকে, আজই যেতে হবে এখনই যেতে হবে, যেতেই হবে।"

যমুনা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। কুণালের শরীরে সে কি তেজ! যমুনার পায়ের কাছে মৃতের মত সাদা কুণালের বায়বিক দেহ পড়ে রইল। তার চোখে যন্ত্রণা ও ক্লেশের কাতরতা।

যমুনা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ধরে রাখার চেষ্টা করে বলে : "যেও না, দাঁড়াও, এখনই যেও না, আমি যে একা। একটু অপেক্ষা করো, আমার ভয় করছে।"

এক মুহূর্তের জন্য কুণাল যেন ফিরে এল। যমুনার হাত দুটি অতি জোরে চেপে ধরে বলে : "মনে রেখ আবার সাতাশ বছর পরে এখানেই দেখা হ'বে। অপেক্ষা করো,—চল্‌লাম।"

যমুনা বোঝে—কুণালের হাতের চাপ শিথিল হয়ে এল। হঠাৎ যেন বসন্ত বাতাসের মত কোথায় মিলিয়ে গেল। লঘুছন্দ-দেহ-কুণাল—যেন একটা স্বপ্নের মত, হঠাৎ গাওয়া গানের মত ফুরিয়ে গেল।

ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদে যমুনা।

বৈশাখ মাস.........

হুগলী জেলার ভবানন্দপুর গ্রামে কুণালের পার্থিব দেহ ভূমিষ্ঠ হ'ল। চমৎকার শিশু। জন্মানোর সময় এমনই তার কান্নাকাটি, আর হট্টগোল যে সেই পল্লী অঞ্চলের ডাক্তার আর দাই রীতিমত ভয় পেয়ে গিছ্‌ল– ডাক্তার বল্‌লেন: "ছেলেটিকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও, বাবা! কি বাজখেঁয়ে চীৎকার ঐটুকু ছেলের!"

জ্ঞান হওয়ার পর কুণালের মার প্রথম কথা—"যাই হোক সোনাকে পেয়েছি ত', সত্যি কি চমৎকারই না হয়েছে। কি চোখ! যেন অন্য কি ভাব্‌ছে। আচ্ছা, ছোট ছেলেমেয়েদের এত বিজ্ঞের মত দেখায় কেন? কিছুই ত' জানে না, তবু মনে হয়, যেন সব ওদের জানা, সব কিছুই দেখা।"

ডাক্তারবাবু ব্যাগটি তুলে নিয়ে বলেছেন: "হয় ত তাই! ওরা ভগবানের শুধু দান নয়, তাঁর চর। গুপ্তচর। অনেক খবর জানে ওরা।"

কুণাল বড় হয়ে ওঠে। মহাযুদ্ধ, মহামারী আর মন্বন্তর অল্পের জন্য সে দেখতে পায়নি। দেখছে স্বাধীন দেশ আর স্বাধীন হাওয়া। পেয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে কলকাতায় কলেজে পড়তে এসেছে। সাঁতার, ফুটবল, এন, সি, সি, সব কিছুতেই সে পাণ্ডাগিরি করেছে। কুড়ি বছর বয়সে বাপের সঙ্গে য়ুরোপ ঘুরে এসেছে, দেখে এসেছে প্যারী আর বার্লিনের বোমা বিধ্বস্ত শহর।

ছেলেটির গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম,—লম্বা নাক, প্রশস্ত ললাট, চওড়া বুক একটা দর্শনীয় বস্তু। চোখ দুটি যেন হরিণের, পুরুষের এমন মায়াময় চোখ সচরাচর দেখা যায় না। সব চেয়ে ভালো লাগে তার দরাজ গলার একটানা হাসির সুর। এমন প্রাণখোলা হাসি শুনেও সুখ।

ছোটবেলায় অনেক বেড়িয়েছে সে বাবার সঙ্গে। একবার তার মনে পড়ে কোন এক অখ্যাত পল্লী-স্টেশনে বিচিত্র পোষ্টার দেখেছিল। কত সুন্দর ছবি, কত নগর, কত মিনার, মন্দির, মসজিদ, তার ভিতরেই লেখা ছিল 'কাশ্মীর পর্যটকের স্বর্গ'। কাশ্মীর নাকি এমনই বিচিত্র প্রাকৃতিক সম্পদে গরীয়ান যে তাকে শুধু স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

কুণাল ছবিটা দেখে বাবাকে বলেছিল—কি সুন্দর ছবি, বাবা, দেখেছ ?—যেন আমার জানা জায়গা, সব কেমন চেনা চেনা লাগছে।……

কুণালের বাপ মাথা নেড়ে বলেছিলেন…আরে—কাশ্মীর! তোমার মা আর আমি যে সেবার পূজোর সময় কাশ্মীর গিয়েছিলাম, তুমি তখন পেটে—উঃ, কি ঠাণ্ডা পড়েছিল সেবার…"

"আমি যাবো বাবা,—ঐ যে অমরনাথের কথা সেদিন বলেছিলে সেখানেও যাবো।"

"আচ্ছা যাস্। বড় হ'লে কত দেশে যাবি। এ ত' কাশ্মীর! আমার কিন্তু আর পাহাড় পর্বত ভালো লাগে না বাপু, ঢের দেখলাম।"

অতিকষ্টে সেদিনের রেলের পোষ্টারের সামনে থেকে সরে এসেছিল কুণাল, কিন্তু সেই থেকে কাশ্মীরের কথা সে মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারেনি আর।

তুষারাবৃত শাদা পাহাড় আর ফুলের অমন বিচিত্র বাহার তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

পড়াশোনার ক'বছর এসব মন থেকে মুছে গিছল কুণালের—পরে হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের 'চ্যাটার্জী এ্যণ্ড চৌধুরী' কোম্পানীর সলিসিটর ফার্মের তরুণতম এটর্ণী কুণালের জীবনে স্বপ্নের অবকাশ ছিল না। ছিল না কল্পনা বিলাসের এতটুকু সুযোগ।

প্রাচীন তথ্য, প্রাচীন পুঁথিপত্র, প্রাচীনতম দলিল প্রভৃতির সন্ধানে তার ছিল অসামান্য দক্ষতা, অপরিসীম উৎসাহ। প্রত্নতত্ত্বে তার এই আগ্রহের জন্য বন্ধুরা বল্‌তেন ঠিক লাইন বাছতে পারোনি ভাই—এই এটর্ণিগিরির ছ্যাঁচড়া লাইন তোমার উপযুক্ত নয়, "ইউ আর এ মিস্‌ফিট ইন দি প্রফেসন!"

আজকের কলকাতার চাইতে সেকালের কলকাতার কথা বেশী জানে কুণাল। এই আগ্রহ তার ব্যবসায়ের সহায়ক, যাদের সত্ব স্বামীত্বের কলহ প্রাচীনকালের তথ্য আর দলিলের উপর নির্ভরশীল, তারা কুণালের হাতে নিরাপদ। কুণাল সহজাত বুদ্ধি প্রভাবে অকূলে কূল মিলিয়ে দেয়।

কুণালের মা কুণালের এই সাফল্য দেখে গেছেন। মরবার সময় তিনি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে গেছেন, এমন সোনার চাঁদ ছেলে তাঁর, এ কি কম গর্বের। কম আনন্দের কথা।

কুণালের যখন ছাব্বিশ বছর বয়স তখন, তখন আবার মনে পড়ল সেই কাশ্মীরের কথা।

একটি মেয়ের সঙ্গে কুণালের বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল। চমৎকার মেয়ে। অনেক দিনের জানাশোনা। একদিন দুজনে সিনেমা দেখতে গেছে, এখন দেখানো হচ্ছে বটে' ছবিটা কিন্তু অনেক আগের, অনেকদিন পরে নতুন প্রিণ্ট নতুন ভাবে দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। অনেক নাচ গানে ছবিটি বোঝাই, ছবিটার নাম 'ধূপছায়া'। সেকালে ছবিটা সকলের প্রশংসা পেয়েছিল। তাই সবাই ছুটেছে। পাহাড় হ্রদ আর ফুলের মনোরম সমাবেশ।

কুণাল পরম আগ্রহে ছবিটা দেখছে। সব দৃশ্য যেন অতি পরিচত। ওর বুকের ভেতর যেন একটা ঘণ্টা বাজছে। মন্দিরের সন্ধ্যারতির গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি। দুবার ছবিটা দেখল। কুণাল একবার সুলতার হাতটা নিজের হাতে রেখে, আর একবার একাই গিয়ে অন্ধকার সিনেমা হাউসে ঢুকে বসল! কিছুই বুঝতে পারে না কুণাল একি হ'ল? দৃশ্যের পর দৃশ্য সে এত নিবিষ্ট মনে দেখছে, যেন তাকে মোহগ্রস্ত করেছে। অথচ হিন্দী ছবির পৃষ্টপোষক সে কোনোদিনই নয়। কোনোদিন কাশ্মীর যায়নি কুণাল,—কোনোদিন তুষারমণ্ডিত কাশ্মীরের পাহাড় সে দেখেনি, তবু যেন সবই তার পরিচিত।

এই ছবি দেখে মনে আনন্দ জাগে, সে আনন্দ বেদনার সমগোত্র। সেই দিন থেকে কাশ্মীর ওকে ডাক্‌ছে হাতছানি দিয়ে। সে যেন এক অস্বস্তিকর আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে। কাশ্মীর তাকে যেতেই হবে—যাবেই সে।

কিন্তু কাছাকাছি ছুটি নেই। ফার্মের এতই জুনিয়র সে যে আবদার করতে ইচ্ছা হয় না। তা ছাড়া পয়সার দাম আছে, প্রতিটি পাই সঞ্চয় করা দরকার। দিনকাল অতি খারাপ। বিয়ের পর সুলতাকে নিয়ে ও কণ্টিনেণ্টে যাবে ঠিক করেছে। তাতেও ত' অনেক টাকা লাগবে।

মনের ইচ্ছা দমন করে মনে রাখে কুণাল। মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে কাশ্মীরের নিসর্গ সৌন্দর্যের কথা। রাতে কিন্তু স্বপ্ন দেখে কাশ্মীরের, যেন কাশ্মীরের হ্রদে সে হাউসবোটে বসে আছে। সে একা—একান্ত একাকী।

কিন্তু তাই কি? আর কেউ কি আসেনি স্বপ্নের সেই স্বর্গে? কে যেন পাশে এসে বসেছিল। কার যেন কণ্ঠস্বর······কার মুখ······কিছুই আর মনে নেই। রাতের স্বপ্ন প্রাতে ম্লান...

ফার্মের কর্তারা লক্ষ্য করছেন, কুণাল অতিশয় গম্ভীর হয়েছে ইদানীং। সবাই বলে ও খাট্‌ছে খুব। তাঁদের ব্যবহার করুণ মধুর···

কুণাল বলে...না কই, আমি ত' বেশ আছি। আমার কথা ভাব্‌বেন না।

ভাবে কিন্তু কুণাল নিজেই নিজের জন্য।

তার ধারণা সে পাগল হয়ে যাবে। কোথাও যেন একটা বিকৃতি ঘটছে। দিনরাত্রি ঐ এক বিশ্রী মনোভাব তাকে উৎপীড়িত করে তুলেছে। যে বাসনা প্রথমে ছিল ছায়া মাত্র, ক্রমশঃই তা দৃঢ়বদ্ধ আকার নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! কাশ্মীর যাবেই সে—শ্রীনগর' বরমূলা, অমরনাথ নামের জপমালা তার মুখে···।

না, আর কোনো পথ নেই। কাশ্মীর টান্‌ছে, সাধ্য কি তার সেই আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার! তাকে যেতেই হবে!

যমুনা পাকড়াশী এদিকে দিল্লীর যন্তর মন্তর রোডে বসে এই একই যন্ত্রণা ভোগ করছে, তারও কাশ্মীর দেখার তীব্র বাসনা। ছোটবেলায় কাশ্মীরের ছবিওলা একখানি বই কে উপহার দিয়েছিল সেই তার সমস্ত মন ভরে আছে।

যমুনা যেন সব দিকে চোখ কান খুলে রেখেই জন্মেছে।

সাত মাসেই তার জন্ম হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল ছেলে হলে নাম রাখা হবে সপ্তর্ষি। ছেলে হয়নি, মা যা চেয়েছিলেন, তাই হ'ল। যমুনা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিষ্ঠ হ'ল। কিন্তু মুখে তার আনন্দ আর উচ্ছ্বাস যেন মাখানো।

কেনই বা হ'বে না, ফুলের বনে প্রায় দীর্ঘ সাতটী মাস তাকে একা থাকতে হয়েছে. সেও পৃথিবীর আলো দেখার জন্য উদগ্র আগ্রহে দিন কাটিয়েছে।

একজন বাঙালী মহাপুরুষের সঙ্গে "স্বর্গলোকে" দেখা হয়েছিল যমুনার—তিনি কথায় কথায় বলেছিলেন, কুণালকে এই স্তরে তিনি দেখেছেন। বল্‌লেন—"ছেলেটি চমৎকার। আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করত ওর অতীত জীবনের কথা। আমি বলিনি, কষ্ট পাবে হয়ত। ১৯১৪-র যুদ্ধে ও ছিল বাঙালী পল্টনের একজন, মেসোপটোমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের গোলায় টুকরো হয়ে যায়, তাই কিছুই মনে নেই পূর্ব জীবনের কথা, থাকেও না অমন অবস্থায়। ওরা অতি অপ্রস্তুত অবস্থায় মরে কি না।"

মহাপুরুষটিকে যমুনা বলেছিল—"আমার আর সময় যে কাটে না, আর যে অপেক্ষা করতে পারি না। আমি যাব।"

"কাঁদো। প্রাণ ভরে কাঁদো। এমন অবস্থা হবে, জননী তোমাকে হয়ত তাড়াতাড়ি প্রসব করবেন।"

এই ভাবেই যমুনার জন্ম হ'ল। দিল্লী শহরে অতি চমৎকার মেয়ে বলে যমুনা পাকড়াশীর সুনাম চারিদিকে, তার রূপের কথা মুখে মুখে।

ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজের সেরা মেয়ে যমুনার বিয়ে হ'ল দিল্লীর হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র উমেশ বাকচীর সঙ্গে। উমেশরা বড় ব্যবসায়ী। কলেজ ছেড়েই সে বাপের বিস্‌নেসে ঢুকে পড়েছে। কয়লা, লোহা, আর চিনির বিরাট কারবারী তারা। সে সংসারে যমুনা আর এক অলংকার।

করোলবাগের বাড়িতে বসে উমেশ বলে—আশ্চর্য! আমি উমেশ বাকচী, অতি সাধারণ প্রাণী, কোন্ ভাগ্য বলে যমুনা পাকড়াশীর পানি লাভ করলাম। এটা কি কম মিরাক্যল—

—অতি সাধারণ! এত বড় পুঁজিপতি বাঙালীদের মধ্যে ক'জন আছে, আমি ত 'কমনার'। ধনীর ঘরে নিধনীর প্রবেশ।

—কিংবা নির্ধনের মনের মণিকোঠায় 'ধনীর' অনুপ্রবেশ?

যমুনা আরাম কেদারায় বসেছিল—বললে 'চল না এই সময় ঘুরে আসি দু'চার দিনের মতো।

—সেই কাশ্মীরের স্বপ্ন দেখছ ত?

—সত্যি আমার যেতে বড় ইচ্ছে করে, চলো না এই সময় গেলে অমরনাথ দেখব।

—বাবা! আমার ভয় করে! কাশ্মীর ভয়ানক জায়গা। কিছু সস্তা দরের হোটেল, হাউস বোট,—ওদিকে অমরনাথের তীর্থ যাত্রী সাধু-সন্নাসীর দল। তার চেয়ে বরং—প্লেনে করে ফার ইষ্ট যাওয়া যাক, কী বলো—চীন, যাভা ইত্যাদি।

—ছিঃ ছিঃ—এখন কি ওখানে যায়। চলো কাশ্মীর ঘুরে আসি।

—কিন্তু আমার যে অনেক কাজ। এখন তো কোথাও যাওয়া যাবে না। বাবা কি বল্‌বেন? তবে যদি 'বিস্‌নেসের' খাতিরে যাওয়া যায়, সে অন্য কথা। দেখি সেই চেষ্টা করি।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কাশ্মীর উপত্যকার কোথাও চলে যাবার জন্য যমুনার মন কাঁদছিল, বিধাতা তার মনোবাসনা পূরণ করলেন। কয়লার ব্যাপারেই কোম্পানীর কাজে শ্রীনগর যেতে হবে উমেশকে।

যমুনাকে এক রকম শূন্যে তুলে উমেশ বলে—কেমন মনোবাসনা পূর্ণ হ'ল ? চলো কাশ্মীর—শ্রীনগর পর্যন্ত ত যাচ্ছি।

—তা ত' বটে—আমি কিন্তু অমরনাথ যাবো।

—আচ্ছা—দেখা যাবে।

যমুনা স্বামীকে ভালোবাসে। কিন্তু সে জানে যে-যমুনাকে স্বামী ভালো বাসে সে আসল যমুনা নয়। প্রকৃত যমুনার রূপ ভিন্ন, মন তার রোমান্টিক, অথচ গম্ভীর। বাইরে সে হাল্‌কা তরুণী, অন্তরে কিন্তু উদ্দামতা নেই, নেই আধুনিকতা। আসল যমুনার প্রকৃতি···

আষাঢ়ের শেষে ওরা শ্রীনগরে পৌঁছল। বানিহালে ডালিমের বনে রক্তিম ফসলের সমারোহ, আপেল গাছ ফলে ফুলে ভরা, আকাশে চমৎকার রোদ, পপ্‌লার আর চেনারের সার বাহার দিয়ে দাঁড়িয়ে—বিচিত্র পাহাড়ি ফুলে প্রান্তর ও প্রান্তদেশ পরিপূর্ণ।

শ্রীনগরে পৌঁছে উমেশ বলে, যমুনা, কি হবে তোমার অমরনাথ গিয়ে, বরং এই শ্রীনগরেই থাকো,—দু'জনে একত্রে থাকা যাক্—কি যে তোমার তীর্থ যাত্রার ঝোঁক।

যমুনা বলে—মিসেস মেহেরচাঁদ বলেছেন, অমরনাথের পূর্ণ তুষার লিঙ্গমূর্তি নাকি অদ্ভুত, পথের কষ্ট কিছুই নয়। একটা না হয় ঘোড়া ভাড়া করে নেব। কত যাত্রী যাচ্ছে।

উমেশ গম্ভীর গলায় বল্‌ল—কিন্তু তোমাকে কি বলে একা ছাড়ি, এই দুর্গম পথ।

—কেন সঙ্গে না হয় বাহাদুর যাবে। ও ত' পাহাড়ি!

—বেশ, তোমার যখন ইচ্ছা, তাই হোক্, তবে আমার বড় কষ্ট হ'বে। আমি যে তোমাকে ভালোবাসি যমুনা। তার আগে আবার বরমূলা ঘুরে যেতে হবে, মনে আছে ?

—ভারী বোকা তুমি! আমিই কি তোমাকে ভালোবাসি না। আমারও কষ্ট হবে বড় কম নয়। তবে কি জানো ক'দিন পরেই ত' ফিরছি। বরমূলায়

মেহেরচাঁদের স্ত্রীকে কথা দিয়েছি, সেও হয়ত অমরনাথ যাবে। নইলে বরমূলা হয়ত যেতাম না। এ কথা কিন্তু যমুনার মনের কথা নয়—

বরমূলার পথে শুধু চাকরটা সঙ্গে নিয়ে যমুনা যাত্রা করল। পাটান পেরিয়ে পথ সোজা চলে গেছে বরমূলায়—সেখান থেকে কোহালায় ঝিলম নদীর তীর ঘেঁষে পথ চলেছে।

যমুনা বরমূলায় পৌঁছালো যখন, তখন বেলা দুপুর। উমেশ তার ব্যবসা সম্পর্কিত এক বন্ধু মেহেরচাঁদকে টেলিগ্রাম করেছিল,—মেহেরচাঁদ যমুনার থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

রঘুনাথজীর বিরাট মন্দিরের পাশেই মেহেরচাঁদজীর বাড়ী।

চারদিকের জানালা খুলে চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়ায় যমুনা। তার স্বপ্নের জগতে এসে পড়েছে। পরিপূর্ণ আনন্দে—অঞ্জলি ভরে পান করে নিসর্গ সৌন্দর্য।

সারা জীবন এইখানেই ত' সে আসতে চেয়েছে।

একটু বিশ্রাম করেই মেহেরচাঁদের গাড়ি নিয়ে চারদিক দেখতে বেরোল। টিলা পাহাড়, অদূরে পার্বত্য কাশ্মীর—ওদিকে ঝিলামের তীর।—শান্ত স্নিগ্ধ পল্লী, —ধান, যব, কলায়ের ক্ষেত সোনার ফসলে ভরা। কাশ্মীরী সুন্দরীদের মায়াময় চোখ। সবই যেন যমুনার স্বপ্নের জগৎ। এই পথ, এই পল্লী প্রান্তর, এই আঙুরের কুঞ্জ সবই যেন ওর চেনা—অতি পরিচিত। মাছকে কিছুকাল ডাঙায় রাখার পর জলে ছেড়ে দিলে সে যেমন প্রথম কিছুক্ষণ জলের ভিতর পরমানন্দে খেলা করে, যমুনাকেও আজ সেই খেলার নেশায় পেয়েছে। সে যেন পরিচিত পুস্তকের পাতা ওলটাচ্ছে। বহুবার পঠিত গ্রন্থের বহু পরিচিত লাইন।

অজস্র ফুলের ভিড়ে সেণ্ট জেসেফ কনভেণ্টের ধারে প্রশস্ত প্রান্তর ভরে আছে, সেইখানে চুপ করে বস্‌ল যমুনা। তিনদিকে পাহাড়, শান্ত গম্ভীর পরিবেশ। সূর্য এখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ছেন, সোনামাখা রোদে সমগ্র নগরটি যেন ভরে আছে। ফুলের বনে তেমনই বসে রইল যমুনা।

সহসা পাশের ফুলের বেড়ে কে যেন সামান্য কাশল—আর কেউ এখানেও আছে নাকি। বিস্মিত হ'ল যমুনা। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে কে কোথায় আছে—। সামনেই এসে দাঁড়িয়েছে পরম রূপবান এক পুরুষ, পরনে

পায়জামা, গায়ে পাঞ্জাবীর ওপর জহর কোট। চমৎকার চোহারা। বাঙালী কি পাঞ্জাবী কি কাশ্মীরী, কে জানে? লোকটির এই আকস্মিক আবির্ভাবে বিস্মিত হ'লেও যমুনা অসন্তুষ্ট হয়নি, যেন এমনই একটা কিছু আশা করেছিল সে—

লোকটি পরিষ্কার বাংলায় বল্‌লে: মাফ করবেন, আপনাকে ভয় দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়।

অপ্রতিভ না হয়ে যমুনা বলে: বারে, ভয় পাবো কেন? আপনি ত' বাঙালী, এইখানেই থাকেন বুঝি? রোজ আসেন এখানে?

—না, আজই প্রথম এলাম, এখানেও এসেছি সবে দিন দুই হ'ল, বাজারের কাছে খালসা হোটেলে উঠেছি। আপনি বুঝি রোজ আসেন?

—আমিও আজ সবে এসেছি, জায়গাটা ভারী ভালো লাগল তাই বসে পড়েছি।

—আচ্ছা, তাহ'লে, মিছামিছি আপনাকে বিরক্ত করেছি কিছু মনে করবেন না,—এই খানটায় শুয়েছিলাম, কখন যে ঘুমিয়েছি জানি না।

—না, না, বিরক্ত কি আর, আপনিও বসুন, এতে আর আমার আপত্তি কিসের।

যমুনার পাশে এসে বস্‌ল লোকটি। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। কথা খুঁজে পায় না কেউ।

—অনেকক্ষণ পরে লোকটি বলে ওঠে—দেখুন, আপনার বাড়ি কি কলকাতায়? কোথায় যেন দেখেছি।

—আমার বাড়ী কিন্তু বাইরে, দিল্লীতেই মানুষ, দিল্লীতেই বিয়ে হয়েছে। কল্‌কাতায় গেছি একবার, সেও খুব ছোট বয়সে। আপনি বুঝি কল্‌কাতা থেকে এসেছেন?

—হ্যাঁ, আমাদের বাড়ীঘর সেইখানেই। আমার নাম কুণাল। কল্‌কাতায় এটর্ণিগিরি করি। এক মক্কেলের কাজে এখানে এসেছিলাম, লোকটা আজ দিন দুই গেছে গুলমার্গে, আমিও তাই প্রাণভরে ভূস্বর্গ দেখছি।

—আমার নাম যমুনা, এসেছি দিল্লী থেকে। অমরনাথ যাওয়ার বাসনা আছে। দু'চার দিন এখানেই থাক্‌বো।

—আপনাকে কিন্তু ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলাম।

—না ভয় পাবো কেন? তবে ভেবেছিলাম আপনি বুঝি কাশ্মীরী—

আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়ত পাঞ্জাবী।

—বাঃ, দুজনেই উল্‌টো ভেবে বসে আছি। কিন্তু আমারও মনে হয় আপনাকে দেখেছি আগে। তার চেয়ে বেশী মনে হয়, হয়ত এই জায়গাটিও আমার পরিচিত। আপনারও কি তাই মনে হয়?

—অমরনাথ যাবেন কি তীর্থ দর্শনে?

—হ্যাঁ, সেই ত' বাসনা, আমার স্বামীর ভারী অনিচ্ছা, তবে শেষ পর্যন্ত কি হয়, উনি এখন আছেন শ্রীনগরে, দু'তিন দিনের ভেতরেই আসার কথা।

—স্বামী শ্রীনগরে, আর আপনি বরমূলায়, যাবেন অমরনাথ। সারা কাশ্মীরটা চষে দেখবেন তা হ'লে।

—হ্যাঁ সেই ইচ্ছাই রয়েছে মনে মনে। সারা জীবন ধরে আমার কাশ্মীর দেখার ইচ্ছা। ছোটবেলায় একটা ছবির বই দেখি, ডাল হ্রদ, কাশ্মীরের শীকারা, শলিমার বাগ, ইত্যাদি সেই থেকেই মনে আমার প্রবল হয়ে আছে কাশ্মীর দেখার বাসনা। আপনাকে হয়ত বোঝাতেই পারবো না কি আমার মনোভাব...

—আমি কিন্তু বুঝেছি। আচ্ছা বলুন ত' এই রকম মনে হয়েছে কিনা— যেন কোনো অতি পরিচিত কবিতার লাইন মনে আসছে না, কোন কাহিনীর শেষ, কোনো গানের সুর? যেমন অনেক সময় কারো মুখ হয়ত মনে পড়ে না। অথচ সে অতি পরিচিত, অতি কাছের মানুষ।

—ঠিক বলেছেন! আশ্চর্য! এমনই মনে হয়।

"কেন জানি না এখানে আসার জন্য আমার মন ক'দিন ধরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মনে হ'ল এ কি পাগলামি আমার। আর এই মাঠের ওপর চুপ করে শুয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। স্বপ্নে দেখেছি—এই আমার সেই পরিচিত মাঠ। এখানেই যুগে-যুগে আমি এসেছি, আমার চির পরিচিত মাঠ। আর দেখলাম একটি মেয়ে—আমার দিকে চেয়ে হাস্‌ছে—, আর—'

—'সেই স্বপ্নে দেখা মেয়েটি আমার মতই দেখতে—?'

—'ঠিক বলেছেন।' কথাটি বলেই একটু সামলে নিয়ে কুণাল বল্‌ল— "ঠাট্টা করছেন!"

—'না, ঠাট্টা করিনি, এ আমার মনের কথা, —জানবেন এখানে আমি শান্তির সন্ধানে আসি নি, কে আমাকে টেনে এনেছে।'

যমুনা কুণালের মুখের পানে তাকিয়ে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নতমুখে।

কুণাল বল্‌ল ...আজ পর্যন্ত একটি কথা সুনিশ্চিত, এইখানে আসার জন্য, এই দিনটির জন্যই সারা জীবন যেন আমার উন্মুখ হয়েছিল।

অতি মৃদু গলায় যমুনা বল্‌ল....আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। জানি না, কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা, কয়েক মিনিট আগে ত' আপনাকে চিনতাম না, কখনও দেখিনি—আপনার নাম জানতাম না পর্যন্ত, আপনি কিন্তু আমার অপরিচিত ন'ন—

—আপনি আমার আত্মার আত্মীয়। কথাটা যেন কাব্যের মত শোনাচ্ছে। যেন অতি রোমান্টিক কথা, কিন্তু না বলেও পারলাম না।

যমুনা, যে কোনো দিন অপর পুরুষের মুখের দিকে ভালো করে তাকায়নি, স্বভাবতঃ যে লাজুক, সে আজ কি করে এমন মুখর হয়ে উঠলো, কোন মন্ত্রবলে ঘুচে গেল তার লাজ-লজ্জা।

দেখা গেল কাশ্মীরের সেই ভূ-স্বর্গের স্বর্গলোকে দুজনের যেন নির্বিকল্প সমাধি ঘটেছে।

প্রথম পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হয়ে উঠল। সকাল থেকে দুপুর উভয়ে একত্রে বরমূলার টিলা পাহাড়ে বেড়িয়ে বেড়ালো। অজস্র ফুল অঞ্জলি ভরে তুল্‌লো। এমন কি রাতে কুণালের হোটেলে এসে যমুনা একত্রে খেয়ে গেল!

অনেক রাতে শুতে যাচ্ছে যমুনা—এমন সময় টেলিফোনে ডাক এল। দৌড়ে গেল যমুনা। শ্রীনগর থেকে ডাক্‌ছে উমেশ—

—কোথায় ছিলে সারাদিন! আরো দুবার ডেকেও পেলাম না! খুব বেড়াচ্ছ বুঝি। মিসেস মেহেরচাঁদকে সঙ্গে নাওনি? কেমন আছো।"

উত্তর দেবে কি, কাঁদছে যমুনা। দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তার।

যমুনা অতিকষ্টে বলে—ভালো আছি। এখন শুতে যাচ্ছি। হাঁ, বেড়িয়েছি খুব, ভালো লাগ্‌ছে—

—আমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে ত'? আমার ত' আর কিছু ভালো লাগছে না।

—একটু চেঁচিয়ে বলো শুন্‌তে পাচ্ছি না।

—আমার জন্য মন কেমন কচ্ছে! ভালো মুশকিলে ফেল্লে, লাংস ফাটিয়ে কি প্রেম নিবেদন করা যায়!

—তাহলে আমি না হয় শ্রীনগরে ফিরে যাই, অমরনাথ গিয়ে কাজ নেই।

—না, না, অতটা স্বার্থপর নই, কেবল ভয় পাছে হারাতে হয়—

—সিলি! কি যে বলো। অত ভয় কিসের?

—না, তোমাকে ফিরে আসতে বলিনি, ওখানেই থাকো দু'চার দিন, আমিও যাচ্ছি, যদি অমরনাথ যাও ত' ভালোই, নয় তো কাশ্মীরটা চষে বেড়ানো যাবে। কি বলো?

যমুনা বল্‌লে—"চমৎকার।" কণ্ঠে এতটুকু জোর নেই।

টেলিফোন থেকে মুখটা সরিয়ে নিল যখন তখন যদি কেউ পাশে থাকৃত সে দেখত যমুনার মুখ, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল, জলে ভেসে যাচ্ছে দুটি আপেলের মত গাল। তাড়াতাড়ি করে ফিরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে যমুনা। আরশিতে মুখ দেখার সাহসও নেই তার, ভীষণ লজ্জা করছে নিজের মুখ আয়নায় দেখতে। বিছানায় টান হয়ে চুপ করে শুয়ে রইল যমুনা,—রাতের মনোরম সৌন্দর্য ঢেকে রাখার জন্যই বোধ করি হাত দুটি দিয়ে চোখ ঢেকে রাখল।

কুণালকে ত' মনের আড়াল করা যায় না। চোখের উপর ভেসে আসে সেই রূপ, সেই হাসি, সেই মুখ। তার কণ্ঠস্বর, গায়ের রক্ত, স্পর্শ সবই যেন সজীব হয়ে ভেসে আসে। যেন সারা অঙ্গে লেগে আছে কুণালের স্পর্শ। তার হৃদস্পন্দনও যমুনার কাছে এখন পরিচিত।

যমুনা ভাবে—আমি বরং চলে যাবো, নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দেব। কেউ জান্‌বে না কোথায় চলেছি। কুণালের সঙ্গে আর দেখা করা ঠিক হবে না। আর যদি দেখা করি বাড়াবাড়ি হবে, মিসেস মেহেরচাঁদও বার বার প্রশ্ন কর্‌ছেন, লোকটা কে? ওকে আমি বড় ভালোবেসে ফেলছি, শেষে আর পালাবার পথ থাকৃবে না। —এই রকম স্বপ্নই ত দেখেছি। স্বপ্ন দেখায় দোষ কি—এখন যদি এখান থেকে চলে যাই উনিও কিছু জানতে পারবে না। কোনো দিন কেউ জানবে না এই গোপন মিলন কাহিনী। একদিন আমিই হয় ত ভুলে যাব—মনে থাকৃবে না কিছুই, যেন কোনো দিন ওকে দেখিনি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফেরে যমুনা। কুণাল—কেন তুমি এই অসময়ে এলে—এখন যে আর কোনো উপায় নেই। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে যমুনা।

সকাল হতেই ছোটে কনভেন্টের পাশের সেই বাগানটিতে। আজ কুণালের কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসবে। আজই শ্রীনগরে ফিরে কাশ্মীর ত্যাগ করার ব্যবস্থা করবে।

কুণাল আগে থেকে এসে ফুলের বনে পদ্মাসন করে বসে সূর্যোদয় দেখছে। যমুনা যেতেই সে লাফিয়ে ওঠে।—যমুনা সব ভুলে যায়—তার মনের আর কিছু নেই—কিছুই মনে পড়ে না।

সে মৃদুগলায় বলে, কি জানি কেন বুঝি না, সব কিছুই কেমন কেমন মনে হয়, যেন এই সত্য আর সব মিথ্যা। এই স্থান—কাল—আর পাত্র-পাত্রী।

প্রতি প্রভাতেই—এইভাবে দুজনের মিলন ঘটে, তারপর মাঝে মাঝে সামান্য বিরতি, অনেক রাতে আবার বিচ্ছেদ ঘটে।

কুণালের মক্কেল ফিরে এসেছে ক্লান্ত হয়ে। এদিকে কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এসেছে—'হোয়াট প্রগ্রেস ? ইফ্ নন, রিটার্ণ!' কুণাল অনেক ভেবে জবাব দেয় 'নাথিং টু রিপোর্ট'।

সময় কাটে,—অতি দ্রুততালে কোথা দিয়ে দিনের পর দিন কেটে যায়। প্রতি রাতে উমেশ শ্রীনগর থেকে টেলিফোন যোগে খবর নেয়। যমুনা জবাব দেয়, এমন তার গলা যেন অপরিচিতের সঙ্গে কথা বলছে।

কিন্তু যমুনা ও কুণালের প্রেম ক্রমে গভীরতর হয়ে ওঠে। যমুনা উমেশের কথা কিছুই বলে না কুণালকে, এমন ভাবে সেদিককার কথা চাপা দিয়ে রেখেছে যেন সেটা কিছু নয়। ইচ্ছে করে যে ও প্রসঙ্গ তোলেনা তা নয়, সে পারে না। এখনকার যমুনার সঙ্গে বিবাহের যোগ নেই এতটুকু। এই যমুনা ভালবাসে কুণালকে, এইটাই সাচ্চা কথা, সে জগতে আর কারো অধিকার সেই। আর কোন পথও নেই।

কল্‌কাতার সেই মেয়েটি এদিকে কুণালকে—রীতিমত চিঠি পাঠাচ্ছে। একখানিও খাম খোলা হয় না,—কুণালের ব্যাগে চিঠি জমা হয়। একদিন না একদিন ওই চিঠি খুলে পড়তে ও জবাব দিতে হবে হয় ত।

এখন সময় কোথায় ?

বর্তমান কাল যেন আনন্দের পরমতম মুহূর্ত—এখন যে হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়—এখন সন্দেহ, সংশয়, পিছে চলে আসা—কিছুরই আর অবসর নেই।

কুণাল একদিন বলে—সত্যি এর ভেতর একটা কিছু রহস্য আছে, নইলে এ ভাবে আমাদের দেখা হবে কেন। যেন সব আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা ছিল। আমরা দুজনেই সোজা এইখানেই এসেছি কেন? কেন এই যোগা-যোগ! জানো তোমার হয়ত অবাক মনে হবে, আমার মনে হয়, আমি যেন অনেক আগে কথা দিয়েছিলাম এখানেই আস্‌ব—

একটু থেমে কুণাল আবার বলে—

—ভারী বেয়াড়া শোনাচ্ছে না? কিন্তু সত্যি যেন অনেক আগে পড়া কাহিনীর মতই কি যেন কানে ভাস্‌ছে······'

যমুনার কোলে কুণালের মাথাটি পড়ে আছে, আর যমুনা তার লম্বা চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে অসীম প্রীতিভরে।

কুণাল বলে—আচ্ছা যমুনা তুমি কি জন্মান্তর বিশ্বাস করো? কি জানি—কিছুই বুঝতে পারি না—মরণে আমার ভয় নেই যদি তুমি কাছে থাকো····

—ছিঃ, তোমার কি ভয় করছে?

—একটু ভয় করছে, পেয়ে হারানোর ভয়, তোমার ভয় নেই যমুনা?

—আমার শুধু ভয় তোমার সঙ্গে হয়ত আর দেখা হবে না।

—মৃত্যুর কথা না ভাবতেই চেষ্টা করি, যখন ছোট ছিলাম তখন ভাবতাম পালিয়ে যাব,—এ সব আমার জীবনে হয়ত ঘট্‌বে না কোনদিন। হয়ত যারা নির্বোধ তাদেরই এই ধারণা। এখন কিন্তু তোমাকে পেয়েছি আর কিছুই ভাবি না।—এখন আর একা নই!

যমুনার হাতটি চেপে ধরে বুকের ওপর রাখে কুণাল।

উত্তেজনায় কাঁপছে যমুনা,—যাক্—ও কথা আর বোলোনা।

—না, ওকথা তুলে আর কাজ নেই। আমরা এক অনির্বচনীয়লোকে এসে পড়েছি। এখানে কেউ নেই, শুধু তুমি আর আমি—দুজনে একা। যেন এর শেষ নেই। হাজার বার তোমাকে হারিয়েছি—আবার পেয়েছি।—কে আমি, কোথা থেকে এসেছি—কিছুই যেন মনে নেই।

উভয়েই নীরব রইল ক্ষণকাল। যেন একটা আসন্ন আতংকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। যমুনা আবার সুরু করে—কাল না হয়—

কুণালের বাহু বেষ্টন দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। মাথা তুলে সে বলে—কাল আরো আনন্দের দিন। কাল আমরা ঝিলামের দিকে যাব: আমি একটা

জিপ পাব, সেখানে না হয় একটু নদীতে বেড়ানো যাবে—কালকের দিন আমোদের দিন।

কিন্তু কালকের এই দিনটি অন্যরূপ নিয়ে হাজির হ'ল। সব কিছু বদলে গেল এই দিনটিতে।

কুণালের মক্কেল হোটেলের দরজায় এসে ধাক্কা দেয় ভোর না হ'তেই।

মক্কেল বললে—"আজ যাচ্ছি আমরা গুলমার্গের দিকে, ভারী চমৎকার পথ আপনাকেও যেতে হবে।—অমনি আমার সেই জমিটাও দেখা হয়ে যাবে। পথেই পড়বে। আমি আবার কালই কাশ্মীর ছেড়ে রাওলপিণ্ডি যাচ্ছি—কি বলেন।"

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে কুণাল বলে ঃ আচ্ছা, যাবো। কাজ আগে। আপনারা বরং লরীতে একটু বসুন—আমি হাত মুখ ধুয়েই যাচ্ছি।

ঘরে ফিরে এসে যমুনার জন্য তাড়াতাড়ি দুচার লাইন লেখে কুণাল—

"—ঠিক সময়েই ফিরব, সন্ধ্যার আগেই দেখা হবে! কাল যাওয়ার বন্দোবস্ত এসে কর্‌ব। যে করে হোক্ ফিরবই সন্ধ্যার আগে। সারাদিন তোমার কথা মনে থাক্‌বে। সেই শাদা সাড়িটাই পরে থেকো। চমৎকার মানায়—আর লাল চপ্পলটা—"

সকালে চায়ের টেবিলে বসতে যাবে চিঠিটা নিয়ে চাকর যমুনার হাতে দিয়ে গেল। চিঠিটার শেষ লাইনে পৌঁছানোর আগেই টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল—শ্রীনগর থেকে ডাকছে উমেশ—

—দু তিন ঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি। কেমন মনটা ঠাণ্ডা হ'ল ত'?

কি আর বলবে যমুনা।—বলে—ভালোই ত'।

তাড়াতাড়ি চায়ের টেবল থেকে উঠে কুণালের চিঠিটা বার বার পড়্‌ল যমুনা। পেনসিলে লেখা অথচ কত সুন্দর। কিন্তু লেখাগুলো এত অস্পষ্ট কেন—সহসা বুঝি যমুনা চোখের জলে চিঠিটা ভিজে গেছে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আকুল হয়ে কাঁদে যমুনা। তার কান্নার স্রোত আর বাধা মানে না।

কতক্ষণ যে এইভাবে ছিল তার মনে নেই, সহসা বাইরে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল। নিশ্চয়ই উমেশের গাড়ি! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে কুণালের সেই সিক্ত চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ফেলে যমুনা, তারপর বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে মুখটা ঠিক করে নেয়।

বারান্দায় মিসেস মেহেরচাঁদের সঙ্গে দেখা হতে তিনি বলে উঠ্লেন—কিগো কাল রাতে কি ঘুম হয়নি? আর ভয় নেই মিষ্টার ত' এসে গেল।

দরজা ঠেলে উমেশ ভেতরে এসে দাঁড়ান।

যমুনার মুখে তখন হাসি, বর্ষণক্লান্ত শারদাকাশে যেন হঠাৎ রোদ ফুট্‌লো।

কিন্তু ওর সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে, সে কাঁপন যেন আর থামে না। মিসেস মেহেরচাঁদও একগাল হেসে উমেশের খাবার আয়োজন করতে চলে গেলেন!

উমেশের চোখে যমুনার এই পরিবর্তন অতি আশ্চর্য হয়ে লাগে। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—হোল কি তোমার যমুনা! এমন শাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কেন তোমার মুখ। অসুখ করেনি ত'?

—না অসুখ করবে কেন?

—কই আমাকে প্রণাম করলে না ত'? কেন এই ব্যতিক্রম!

পল্লীগ্রামের মেয়ের মত জিভ্ কেটে তখনই গলায় কাপড় দিয়ে প্রণামের উদ্যোগ করতেই—উমেশ তার হাত ধরে বলে—না না থাক্,—আমি ঠাট্টা করছিলাম।

—না গো ঠাট্টা নয়, ঠিকই বলেছ তুমি। প্রণাম আমাকে করতেই হবে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যমুনা:

যমুনা ভাবে স্বামীকে কিছুই বলা হবে না। পুরুষের মন সন্দেহ আর সংশয়ে বোঝাই। তা ছাড়া উনি আমার স্বামী, আমাকে ভালোবাসেন, ওকে আঘাত দেব কি করে, সে আমি পারব না।

তাই উমেশ যখন প্রস্তাব করল দুপুরেই ঝিলামে যাবে তখন আপত্তি করতে পারল না যমুনা।

বললে বেশ ত—আমি তৈরী হচ্ছি। মিসেস মেহেরচাঁদও যাচ্ছেন ত'—দূর পাল্লা! ওঁরা এদেশের লোক। তা'ছাড়া আমরা দুজনে যাচ্ছি শুনলে উনি কি আর যেতে চাইবেন। কিন্তু তোমার শরীরটা ভালো ত'?

এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হ'ল যে কুণালের জন্য দু চার ছত্র লিখতে পারল না যমুনা।

মিসেস মেহেরচাঁদ দোর গোড়া পর্যন্ত এসে হেসে এগিয়ে দিয়ে গেলেন!

উমেশের গাড়ি সবেগে ছুটে চল্‌লো।

এই মনোরম ভ্রমণের মুহূর্তে যেন সে এতদিনের বিরহ বিশীর্ণ হৃদয়কে উৎসবানন্দে মাতিয়ে তুলতে চায়। তাই উমেশও আজ গানের লাইন গুন গুন করছে। কদাচিৎ তার মুখে লোকে গানের সুর শুনেছে। বার বার যমুনাকে অনুরোধ করে—একটা গান সুরু করোনা।

যমুনার সেই মন নেই। সে চুপ করে নিসর্গ সৌন্দর্য দেখ্‌ছে! হঠাৎ প্রশ্ন করে উমেশ—ভয় করছে? বড্ড স্পীড দিয়েছি না!

—না।

কিন্তু সত্যই তার ভয় করছে। জীবনের ভয়—মরণের নয়। কুণালহীন জীবন ধারণ অর্থহীন। যে জীবনে কুণালের আবির্ভাব হয়েছে সেই জীবনকে কি করে সে ধুয়ে মুছে ফেলবে।

গাড়ি হু হু শব্দে ছুটে চলেছে উরি হয়ে সোজা কোহালার ঝিলাম নদীর তীর পর্যন্ত।

হাওয়ায় যমুনার চুলগুলি উড়ে এসে মুখে পড়েছে। মোটরের আয়নায় লক্ষ্য করলো যমুনা—উমেশের চোখ দুটি কেমন যেন ঘোলাটে, ভাবাবেগহীন।

দেখতে দেখতে—সেন্ট জোসেফের কনভেন্ট, সেই ফুলে ভরা মাঠ পার হয়ে এল। যমুনা চোখ মুছল।

উমেশ আবার বলে—কি—খুব বেশী স্পীড মনে হচ্ছে?

—না!

—গাওনা তোমার সেই 'ঝড়ে উড়ে যায় যায় গো

আমার মুখের আঁচল খানি—'

বিস্মিত যমুনা শুধু বল্‌লে—আজ তোমাকে গানের ভূতে পেয়েছে: হঠাৎ এত পুলক কেন?

—পুলক হবে না? "বঁধুরে আমার পেয়েছি আবার, ভরেছে কোল।" এ যে ঝুলন!

ঝুলন বটে!

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল যমুনা—

দেখো—দেখো—

সামনেই পাহাড়ের ধার ঘেষে খাদ নেমেছে সোজা নীচের দিকে। সামনেই এক টাঙ্গা পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে ঃ অনেক নীচে আবার সমতল।

উমেশ চেপে ব্রেক কষে,—একটা বিশ্রী আওয়াজ করে মোটর বোধ হয় থামল। গাড়ি সোজা গিয়ে পড়ল সেই টাঙ্গার ঘোড়ার ওপর। হয়ত স্পীডের জন্য গাড়ীটা দুবার পাক খেয়ে উল্‌টে পড়ল।

যমুনা দেখল পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখর, নীচে শস্য শ্যামলা ক্ষেত—মধ্যে কত কি। কত নীচে—কে জানে।

যমুনা ভাবে—এই ত' মৃত্যু! কুণাল হয়ত জানতেই পারবে না কেন আমি চলে এসেছি! কোথায় এলাম।

কি একটা ভারী জিনিষ যেন ওর দেহে পড়েছে,—হাত দুটি যেন শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। দেহের কিছু অংশ হিম শীতল জলে পড়ে আছে।

অনেকক্ষণ কিছুই বোঝেনি যমুনা। যখন জ্ঞান ফিরল—তখন যেন মনে হ'ল মেহেরচাঁদের বাড়ীতেই সে ফিরে এসে বিছানায় পড়ে আছে। ঘরটা ছায়ায় ঘেরা। আলো নাই এতটুকু।

তার সারা দেহে যেন অনেক ফুল। হাতে, মাথায়, বুকে। কারা যেন কাঁদছে, ভীষণ কাঁদছে—চুপ করে শুয়ে আছে যমুনা। চিন্তা করছে—কি যেন হ'ল। গাড়ীটার সঙ্গে টাঙ্গার ধাক্কা লেগেছিল?

তারপর···· ··· ?

এ আমি কোথায়?

যমুনার মনে হয় যেই হোক—ও কান্না থামাক। কান্না যে আর সয় না। কোথায় কাঁদছে—পাশের ঘরে! কটা বেজেছে?—চোখ খুলে দেখলো যমুনা চারদিকে রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আছে। জানালাগুলি খোলা! আকাশে অনেক তারা।—নীচে যেন অনেক গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে, তাদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। টুকরো কথা,—এলোমেলো শব্দ,—কোথা থেকে পাওয়া যাচ্ছে সুমধুর সঙ্গীতের সুর।

মনে পড়ল—একটু একটু করে কুণালের কথা মনে পড়ল। সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করবার কথা। কিন্তু কোথায় সে?

নিশ্চয়ই যমুনা ঘুমিয়ে পড়েছিল!

উঠে পড়ে যমুনা। প্রথমটা কেমন অস্বস্তি বোধ হয়, মাথাটা যেন ঘুরছে, দেহটা টলটল করছে। পা যেন অতিকষ্টে মাটি স্পর্শ করছে।

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় যমুনা। আধো আলো আধো অন্ধকারে নিজের মুখখানি দেখে। ভাবে কেমন যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে—কেন এত ঘুমিয়েছি কে জানে? উমেশ কি এসেছিল? ঝিলামের বুকে শীকারা করে বেড়াতে গিয়েছিলাম কি? তারপর···পথে কি একসিডেণ্ট হয়েছিল?

মাথা নাড়লো—যমুনা। এখনও স্বপ্ন দেখ্‌ছি। বোধ হয় তা'হলে মরেই গেছি। কিন্তু···তাই বা কি করে হবে! ঠিক মরার মত মনে হচ্ছে না ত'! কেমন যেন মজা লাগছে। মরে গেছে এই কথাটি ভেবে ভীত হ'য়ে ওঠে যমুনা। কেমন যেন অস্বাভাবিক কাণ্ড! বিশ্বাস করতে চায় না সে। এখনই জামা কাপড় ছেড়ে ছুট্‌বে সে। কুণালের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।—কি মনে করবে সে? তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে ট্রাঙ্ক খুলে সেই সাদা কাপড়, লাল চপ্পল বের করে পরে যমুনা। কিন্তু ট্রাঙ্কটা কাদা ও জলে নোংরা হয়ে রয়েছে, ভেতরের কাপড়-চোপড় নষ্ট হয়নি তো!

কোথা থেকে গান ভেসে আসছে, কুণালের খালসা হোটলে এম্‌প্লিফায়ারে বাজাচ্ছে সিনেমার হালকা গান। কিন্তু বেশ আমোদ আনে মনে। মনটা ভরে দেয় আনন্দ রসে। চললো যমুনা সেই দিকে।

এদিকে পাশের ঘরে হাতে মাথায় বাণ্ডেজ বাঁধা উমেশের মনে হ'ল,—যমুনার ঘর থেকে যেন একটা আলো দেখা গেল, দরজাটাও খুলে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে উমেশ ঘরে এসে দেখে—যমুনার দেহ তেমনই নিশ্চল হয়ে ফুলের স্তূপে চাপা রয়েছে। মৃত্যু-শীতল মুখখানি কাগজের মত সাদা। কেঁদে কেঁদে উমেশের চোখ ফুলে উঠেছে।

লজ্জায়, দুঃখে, শোকে সে আত্মহারা হয়ে গেছে।

উমেশের মনে ভেসে ওঠে এক এক করে সব কথা—

টাঙ্গাওলার সঙ্গে সে ঝগড়া করেছিল।

যমুনাকে খুঁজতে গিয়ে দেখে তাঁর বুকের উপর—গাড়ির অর্ধেক অংশ চাপা পড়েছে। চীৎকার করে ডেকেছে উমেশ পাগলের মত—যমুনা—যমুনা—

এখন আসল যমুনা আর এখানে নেই, পড়ে আছে তার দেহটা। আবার চোখ মুছলো উমেশ।

আবার অনেক দিন পরে দেখা হ'ল—যমুনা ও কুণালের। আবার সেই মাঠ, সেই ফুল,—সেই হিমেল পরিবেশ।

যমুনার কোলে মাথা রেখে কুণাল চুপ করে শুয়ে আছে—

যমুনা বলে—এত দেরী হোল তোমার। আমি সেই কবে থেকে এসে বসে আছি।

কুণাল বলল—দেরী বলেই তোমার মনে হচ্ছে। কিন্তু বেশী সময় লাগেনি। আমিই কী জানতাম এত শীঘ্র আসতে পারবো। আবার যে এই ভাবে মিলন হবে কে জানতো!

যমুনা বলে ওঠে—এ সম্পর্ক যে জন্ম জন্মান্তরের। চিরন্তন ধারায় আমরা বাঁধা। বার বার এই ভাবে যাবো আর আসবো।

নিবিড় বাহুবন্ধনে কাছে টেনে নেয় কুণাল।

দাগ

বাসওলাদের হিসাব মত জায়গাটার নাম আট নম্বর। কেন যে আট নম্বর তা কেউ জানে না। কেউ কোনদিন প্রশ্নও করে না, জানে এই অঞ্চলটার নাম আট নম্বর। পোর্ট কমিশনারের মালগাড়ী যাবার লাইন বড় রাস্তার বুক চিরে চলে গেছে, তাই যখন তখন লেভেল ক্রসিং-এর মুখে গেট বন্ধ হয়ে যায়, হয় মালগাড়ী নয় ইঞ্জিন চলছে—মাঝে মাঝে কিন্তু ঘণ্টা বাজিয়ে গেট বন্ধ করে, তখন বুঝতে হবে ডকের পোল খুলে দেবে—সঙ্গে সঙ্গে পায়ে-চলা মানুষ দৌড়ুবে, কিছু থমকে দাঁড়াবে, উপায় থাকলে কিছু লরী, প্রাইভেট গাড়ি পিছু হটবে, অন্য পোলের ওপর দিয়ে যাবে—আর একান্ত উপায় না থাকলে—দাঁড়াও আধঘণ্টা....

ঘণ্টা বেজেছে। সারবন্দী গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়েছে, বাস, লরী, ট্যাক্সি, ইত্যাদির ভিড়—দু'টি লাঠির ওপর ভর দিয়ে গেটম্যান এগিয়ে এসেছে সবাইকে হুঁশিয়ার করতে, পুরানো লোক, সবরকম অবস্থার সঙ্গেই তার পরিচয় আছে।

আমার গাড়ীটার সামনে দু'টি লরী, পিছনে চীনা সাহেব ভর্তি দু'টি ট্যাক্সি, সুতরাং জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ,—ব্রীজ না জুড়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে, দু'খানা বড় বড় জাহাজ পাশ করবে, তার কাপ্তেনরা ওপরের তলায় মেগাফোন-মুখে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে।

গাড়ী থেকে নেমে লেভেল ক্রসিং-এর গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। গেটম্যানটি আসলে কতখানি লম্বা ছিল কে জানে, এখন দু'খানি লাঠি ধরে ঝুঁকে পড়ায় দেখাচ্ছে সাড়ে তিন ফুট। দু'খানি পা নেই, অথচ কেমন যেন স্বচ্ছন্দ চলাফেরা। মাথার চুল ভ্রমর-কালো, মাঝে মাঝে কয়েকগাছি সাদা চুল চিক্ চিক্ করছে, মুখের ভাবে মনে হয় পঞ্চাশ ঘেঁষেছে। পা নেই বটে, হাতের পেশীগুলি কিন্তু বেশ সবল ও সতেজ। সহজেই অনুমান করা যায় পা দু'খানি কাটার আগে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছিল।

লোকটা প্রশ্ন করল—কোথায় যাবেন স্যার, মেটেবুরুজ ?

—আর এক মিনিট হ'লে আমি পাশ করিয়ে দিতুম। তা গাড়ীতে এখনও মিনিট কুড়িক্ লাগবে।

ওদিকের ব্রীজটা দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম—যদি ওপাশ দিয়ে ঘুরে যাই ?

—ঐ একই হাল হুজুর! হাইড রোড পেরিয়ে টানা যাবেন। একই টাইম লাগবে! একি দেখছেন ? মিলিটারির সময় এমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে—কত লরী আর কত সাহেব, বেটারা যুদ্ধ করতে চলেছে, না চড়ুইভাতি করতে চলেছে বোঝা দায়।

লোকটা হঠাৎ থামলো, সামনেই এক রোগা লম্বা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে, গেটের ভেতর মাথা গলিয়ে পালাতে চায়,—পোষাক-পরিচ্ছদে বেশ ভদ্রগোছের মনে হ'লেও, বোঝা যায় স্ত্রীলোকটি অল্প ছিট্‌গ্রস্ত। চেঁচিয়ে উঠলো গেটম্যান—খবরদার—

তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে এগিয়ে এলো স্ত্রীলোকটি—বেশ মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গী, মুখশ্রী সুন্দর, ঘন কালো চোখ, মাথার চুলগুলি কিন্তু অধিকাংশ পেকে গেছে—

প্রথম নজরে বছর পঞ্চাশ বয়স মনে হবে—কিন্তু কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল বয়স অনেক কম। চকিতে একবার আমার দিকে তাকিয়েই খঞ্জ গেটম্যানের পানে তাকালো—তারপর প্রশ্ন করলো—

—ইসমায়েল মিঞাকে দেখেছ—আমার খসম, লোকে ক্ষুদু মিঞা বলে—

অতি ভদ্রগলায় গেটম্যান বলে—না, ঐ নামে কেউ যায় নি বিবিসাহেব। কখনও শুনিও নি।

মুহূর্তের জন্য বেদনায় ভরে উঠলো রমণীর মুখ, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বেশ শক্ত হয়ে গেল তার মুখভঙ্গী, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ফিরে দাঁড়াল—

করুণ গলায় বলল—তা হ'লে কাঁটাপুকুর যাই, কি বলো ? কাঁটাপুকুরেই মিলতে পারে, কি বলো ?

এই ক'টি কথা বলে তাকায় আমার মুখের দিকে, যেন জবাবের প্রত্যাশায়। —খঞ্জ গেটম্যান হঠাৎ ওপাশে সরে গেল।

স্ত্রীলোকটি আমার দিকে তাকিয়ে বললো ঃ আমাকে কিছু দেবেন বাবু!

অনেক দূর—কি যে করি, কি বিপদেই যে ফেলে গেল আমাকে—কোথায় খুঁজি বলতো বাপজান ?

স্বভাবতঃ তেমন দানশীল না হ'লেও কি যেন কেন বৃদ্ধার কথায় কি ছিল, পকেট থেকে একটি টাকা বার করে হাতে দিয়ে দিলাম। বেশ শান্ত ভাবে খোদার দোয়া প্রার্থনা করে স্ত্রীলোকটি চলে গেল। গলির মোড়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার দিকে তাকিয়ে আপন মনে চুরুট টানতে থাকি।

ইতিমধ্যে কখন খঞ্জ ফিরে এসেছে কে জানে। সে আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বলল—ও কে জানেন না বাবু ?

যেন আমিই ওকে প্রশ্ন করেছি—অর্থাৎ আমার মনের ভাব সে বুঝেছে।

—এদিককার সবাই ওকে জানে, ওর নাম মিরিয়ম বিবি। পাগলী মিরিয়মকে চেনে না হেন লোক নেই। দশ বছর আগে ও এদিকে এসে পড়ে, এখন সমানে হেঁটে যাবে সেই কাঁটাপুকুরে—খুঁজবে ইসমায়েলকে,—

—কিন্তু কি যেন বলছিল—

—হ্যাঁ, এখন যাবে কাঁটাপুকুর। আমি ত' বলেছি হুজুর, তখন এসব অঞ্চল মাড়ায় কার সাধ্যি,—কি মিলিটারির ভীড় চার পাশে, আর কি লরী—

—মিরিয়ম এসেছিল বাউড়িয়া না ঐরকম কোথা থেকে, চমৎকার মেয়ে, কি রূপ, আজ আর ওকে দেখে চিনতে পারবেন না, কিন্তু দশবছর আগের মিরিয়ম ছিল অন্যজন।

—ভালো ঘরের মেয়ে, শুধু চিনতো ঐ ক্ষুদু মিঞাকে, ইসমায়েল, ইসমায়েল করে পাগল, ক্ষুদুও ভালোবাসতো মিরিয়মকে। মিলিটারির কাজ কাম খতম হ'ল, ক্ষুদুর হাতে পয়সা নেই, মিরিয়ম তা গ্রাহ্যও করে না, ঠিক করলো দু'জনে যাবে সীতারামপুর, সেখানে বড় কাজ জুটবে। মিরিয়ম কোনো কিছুতেই 'না' বলে না।

—চললো দু'জনে, সেখানকার কারখানা পনের দিনের ভেতর দরজা বন্ধ করলো। যুদ্ধ থেমে যেতে লোকসান হচ্ছে কোম্পানীর। খবর হ'ল দামোদরের ওধারে বাঁধের কাজ হচ্ছে।—ইসমায়েল বলল—মিরিয়ম তুমি থাকো, তুমি অতটা চলতে পারবে না। আমি যাই, তুমি হয় এখানে থাকো, নয় কাঁটাপুকুরে ফিরে যাও। মিরিয়ম হাসে—

—দু'দিন পরেই ফিরে এলো ইসমায়েল। ফোরম্যানের সঙ্গে বনলো

না। তার নাকে ঘুঁষি মেরে পালিয়ে এলো—ইসমায়েল এখানে ফিরে এলো। শুনলো কিছু আগে মিরিয়ম সেখান থেকে কাঁটাপুকুর গেছে—সে ঠিক দশবছর আগের কথা।

—ইসমায়েলের দেরি হ'ল, পথে একটা কাজ জুটে গেল। প্রথমটা দু'দিন, তারপর বারোদিন।—ইসমায়েলের ইচ্ছা হাতে একটু টাকা জমিয়ে নিয়ে যাবে, মিরিয়ম অবাক হবে।

—তখন থেকেই মিরিয়মকে সবাই জানে,—ইসমায়েল ওকে ঐ বলেই ডাকতো, আসলে ওর নাম নসীবন বিবি।

—এ অঞ্চলের সবাই মিরিয়মকে চিনলো,—পথ চলতি মানুষ সকলে জানলো মিরিয়মের খসম ইসমায়েলকে পাওয়া যাচ্ছে না। দিনের পর দিন ঐভাবে চুল এলিয়ে এই লম্বা মেয়েটা 'ইসমায়েলকে দেখেছ গো? আমাদের ক্ষুদ্র মিঞা!' বলে সবাইকে প্রশ্ন করছে।

—একদিন এই দিকেই খুঁজতে এসেছিল মিরিয়ম। ড্রাই-ডকে কাজ সেরে ইসমায়েল ফিরছিল। মিরিয়ম কিভাবে খবরটা পেয়ে গিছল—

—দূর থেকে মিরিয়মকে দেখে দৌড়ে এলো ইসমায়েল—কাজ-কাম ফেলে এই লাইন ক্রস করে আসছে। একেবারে কাণ্ডজ্ঞান নেই—এমন সময় একটা ইঞ্জিনের পেছনে চারখানা খালি ট্রাক,—সান্টিং হচ্ছিল,—হতভাগা ইসমায়েল আধাআধি কাটা গেল। একেবারে মিরিয়মের চোখের ওপর।

—ঠিক সেই ভাবে পাথর হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো মিরিয়ম,—মানুষটার আধখানা দেহের দিকে তার চোখ দু'টি যেন আটকে গেছে। তারপর তখনই মুখ ফিরিয়ে চল্‌লো কাঁটাপুকুর—সেই পথেই সে এসেছিল।

—মনে হয় যেন ওর মনটার ওপর কে যেন পরদা চাপা দিয়েছে হুজুর, দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিলে যেমন হয়। ঐ দ্বিখণ্ডিত দেহ সে কিছুতেই সইতে পারেনি।

—সেই থেকে ইসমায়েলকে খুঁজছে, কাঁটাপুকুর থেকে আট নম্বর—আর আট নম্বর থেকে কাঁটাপুকুর,—আজ দশবছর এই চলছে—

—প্রতিদিন এইভাবে যাতায়াতে পাঁচ-ছ' মাইল হবে, আজ দশ বছর এই চলছে—ইসমাইলকে দেখেছগো?

মিরিয়ম দশ বছরে এক হাজার মাইল হাঁটলো। অথচ ক্ষুদ্র মিঞা এই জীবনে আর এক পাও চলতে পারবে না।

—এই জীবনে? মানে?—আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম!—তুমি যে বললে ক্ষুদ্র দু'খান হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, হুজুর, ওপর বাগটা জিন্‌দা রয়ে গেল কি-না সেই ত' আফসোস, অবশ্য এখন আর আমার নাম ক্ষুদ্র নয়—

চারিদিক কাঁপিয়ে ঘণ্টা বেজে উঠল—

পোলটা জোড়া হয়ে গেল;

এইবার আবার লোক চলাচল সুরু হবে।

অভিনয়

কল্‌কাতা শহরে আপনি যদি কাউকে প্রশ্ন করেন 'বনমালী মজুমদারকে কখনও দেখেছেন ?' তাহ'লে নিশ্চয়ই উত্তর পাবেন 'কেন দেখবো না, কতবার দেখেছি।' তারপর যদি জানতে চান—'লোকটি কেমন ?' তাহলে তারা মাথা চুলকে জবাব দেবে, 'তা লোকটি বেশ চালাক-চতুর সন্দেহ নেই, কিন্তু...' কিংবা "ওরে বাবা! ব্যবসায়ে একেবারে ঘুণ! ওর কাছে ঘেঁষে এমন বাঙালী ক'জন আছেন? তবে···আপনি যদি আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে খবর নেন এই সব 'তবে' এবং 'কিন্তু'র প্রকৃত অর্থটা কি, তাহ'লে তারা বিশেষ কিছু বলতে পারবে না, আমতা আমতা করবে।

লোকে যখন বলে লোকটি 'চতুর', সত্য কথাই বলে।

লোকটি সম্পর্কে প্রথম রহস্য এই যে বনমালী মজুমদার তাঁর প্রকৃত নামই নয়, তাঁর বাবার উপাধি পালচৌধুরী, এবং প্রকৃত নাম জগদীশ। জগদীশ পালচৌধুরী নামেই পরিচিত ছিলেন, রেল আপিসের নীচের তলার একটি কেরাণীগিরিও জুটিয়েছিলেন। লোকটি গম্ভীর, শান্ত ও সৎস্বভাব।

কলেজে রসায়নে তাঁর আগ্রহ ছিল, তাই একটা দেশী কারবারে কেমিষ্টের কাজ পেয়ে তিনি রেলের চাকরী ছাড়লেন। বিয়েও করলেন অমিয়া হাজরাকে, —কলেজে পরিচয় হয়েছিল। অমিয়া মেয়েটি ভালো,—তেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল না বটে, তবে সে জগদীশকে ভালোবাসত। বালী আর বেলুড়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বাসা করেছিল ওরা। মোটামুটি বেশ সুখেই দিন কাটছিল।

স্বামী হিসাবে যা যা করণীয় জগদীশের তাতে ত্রুটী ছিল না, মাসকাবারে মাইনের টাকার সবটাই স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে খবরের কাগজ পড়ে' আর বাগানে শাক-সবজীর পরিচর্যা করে দিন কাট্‌তো। ইতিমধ্যে ছেলেপুলেও দু'একটি হয়েছিল।

বিস্ময়ের বিষয় অমিয়াকে কিন্তু কোনোদিন কোনো কথা বলতো না

জগদীশ। জীবনের অনেক তত্ত্বই সে গোপন করে রেখেছিল। অমিয়ারও এ সব বিষয় তেমন মাথা ব্যথা ছিল না।

শুধু অমিয়াই যে অন্ধকারে ছিল তা নয়, কেউ জগদীশের মনোরাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ বাহ্যিক রূপের চাইতেও জগদীশের মনোজগতের গঠন ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

মনের ভেতর একটা ক্রুদ্ধ আবেগ রুদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘকাল।…"আমি চাপা পড়ে যাচ্ছি"…"আমাকে সবাই দাবিয়ে রেখেছে"…"আমি নীচে পড়ে যাচ্ছি"…"অতলে ডুবছি"—এই ছিল তার ধারণা।…"আমার কাজের দাম হাজার হাজার টাকা, ওরা আমাকে দেয় মোটে দুশো টাকা, আর পাঁচ বছর পরে বেড়ে হয়ত তিনশ হবে, এইভাবে পাড়াগাঁয়ে বসে জীবনের দিন কাটাতে হবে। শুধু যদি কিছু মূলধন থাকতো, তাহ'লে কি আজ পরের দাসত্ব করতে হয়।"

ওর মাথায় যে এসব খেলছে কেউ জানতো না। এমন সময় অমিয়ার পিসিমা কাশীতে হঠাৎ গঙ্গালাভ করলেন, আর তাঁর হাজার দশেক টাকা সোজা অমিয়ার হাতে এসে গেল। ঘটনাটি তেমন অপ্রত্যাশিত নয়, অমিয়া অনেক দিন ধরে মনে মনে একটা খরচের খসড়া করে রেখেছিল! এই টাকায় একটা বাড়ি করবে, তবুও তো নিজের বাড়ি হবে। ভাড়াটে বাড়িতে বাস করে বারো মাস বাড়িওলার মুখনাড়া সয় না। জগদীশও কোনোদিন অন্য কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। বাড়ি কেনার কথাই আলোচনা করেছে। কিন্তু টাকাটা যেদিন নিয়ে সে পথে বেরোল সেদিন আর উকীলের বাড়ি না গিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে গেল।

সেইখানেই জগদীশ পালচৌধুরীর অপমৃত্যু। কেউ আর তাকে দেখেনি বা তার কথা শোনেনি। অমিয়া খোঁজ-খবর করে হয়ত ধরতে পারত, শাস্তিও দিতে পারত, কিন্তু সে কিছুই করল না। পুলিসের এক বড়কর্তার সঙ্গে ওদের আত্মীয়তা ছিল, তিনি ছোটবেলা থেকেই অমিয়াকে স্নেহ করতেন, তাই কি হয়েছে অনুমান করে একটা জোর তদন্ত করতে চাইলেন, অমিয়া কিন্তু বল্‌ল—টাকাটা সে জগদীশকে স্বেচ্ছায় দিয়েছে, এবং টাকার জন্যই হয়ত কোনো দুষ্ট লোক তাকে কেটে ফেলেছে। পুলিসের কর্তা মাথা চুল্‌কে চলে গেলেন।

অমিয়াও মনে মনে বোধকরি ভেবেছিল জগদীশ একদিন ফিরে আসবে এবং একটা বিরাট কিছু করে ফিরবে। এর পর সে বছর কয়েক বেঁচেছিল আর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই ধারণাই তার ছিল। ছেলে দুটিকে অতিকষ্টে মানুষ করার চেষ্টা করছিল, স্বামী ফিরে এসে যেন উপযুক্ত ছেলে পান, এই তার অভিলাষ ছিল। বাড়ি কেনা হয়নি বরং এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে বিতাড়িত হতে হয়েছে, সামান্য স্কুল টিচারী করে ছেলেদের সে পড়িয়েছে। ছোট ছেলেটা কিন্তু মার মৃত্যুর আগেই একদিন ফুটবল খেলতে গিয়ে আঘাত পেয়ে ধনুষ্টঙ্কার রোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেল। অমিয়া আর একবার চোখ মুছলো। এই ছেলেটিই তার বেশী প্রিয় ছিল। স্বামীর নিরুদ্দেশে অমিয়ার শরীর ভেঙে পড়েছিল কিন্তু মনে আশা ছিল একদিন সে আসবে। ছেলে কিন্তু একেবারে বুক ভেঙে দিয়ে গেল।

অমিয়া বিছানা ছেড়ে আর উঠলো না।

এদিকে জগদীশ পালচৌধুরীর মৃত্যু ঘটেছে। এখন তিনি বনমালী মজুমদার। তাঁর ধারণাই ঠিক, কিছু মূলধনেরই অভাব ছিল। মূলধন হাতে পাওয়াতে সব রাস্তা খুলে গেছে। প্রথমে বউবাজারে একটা ছোট ওষুধের দোকান খুললেন। কিছুদিনের ভেতর পেটেণ্ট ওষুধও বার করলেন, তারপর এল মহাযুদ্ধ ও মড়ক। খালি শিশিতে জল বোঝাই করে, জাল ওষুধ বিক্রী করে আর কালোবাজারে চড়া দামে মাল বেচে বনমালী মজুমদার রাতারাতি বড় লোক হয়ে গেলেন। সরকার কখন কি চাইবেন বনমালী তা পূর্বাহ্ণেই বুঝতে পারতেন আর সেই মত কাজ করতেন। যুদ্ধের শেষে তাই বনমালী মজুমদার একদিন রায়বাহাদুর উপাধি পেয়ে গেলেন, লোকে বলে ইংরেজ থাকলে এতদিন স্যার হ'তেন।

বেনামে কোনোদিন অমিয়াকে টাকা দিয়ে তিনি সাহায্য করেননি, বরং পূর্বজীবনের সকল স্মৃতি চাপা দেওয়ার জন্য দাড়ি রেখেছেন, মাথার টাকটা এই ক'বছরে বিশেষ বিস্তার লাভ করায় মাথার কথাটা ভাবতে হয়নি। তা ছাড়া ঐ বিরাট ডি সটো গাড়িওলা ব্যক্তিটি যে বালীর সেই ভাড়াটে জগদীশ একথা কে বলবে? অমিয়ার মৃত্যু সংবাদও তিনি পেয়েছেন কিন্তু ছেলেটার কি হ'ল খবর নেননি। এক হিসাবে তিনি যেন সংসারমুক্ত সন্ন্যাসী।

যুদ্ধ থামলো। সুযোগ সুবিধা কিছু কমলো বটে কিন্তু বনমালী মজুমদারের ক্ষমতা দিন দিন বাড়তে লাগলো। 'নবভারত কেমিক্যালসে'র প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়তে লাগল,—শহরের বড় বড় কোম্পানী একরকম হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁরা 'নবভারতের' এই প্রতিপত্তিতে বিস্মিত হয়ে পড়লেন। কয়েকজন তরুণ কেমিষ্ট বেশী মাহিনার লোভে 'নবভারতে' ঢুকে পড়ে অনুতাপ করতে থাকে। বেরোবার পথ পায় না, অথচ তাদের নতুন আবিষ্কারে লাভবান হচ্ছে 'নবভারত'। একজন সম্প্রতি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গিছলেন—সেখানেও জয় হয়েছে বনমালীর। আর সেই তরুণ কেমিষ্ট সর্বস্বান্ত হয়েছে। বনমালীরই প্রায় বিশ ত্রিশ হাজার টাকা মামলায় খরচ হয়েছে। কিন্তু তিনি জানেন ছোকরার ফরমূলায় ওরকম অনেক বিশ ত্রিশ হাজার আবার হাতে আসবে।

সুপ্রীম কোর্টের মামলার পর বনমালী মজুমদার ঠিক করলেন এইবার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। শরীরটাকেও একটু দেখা দরকার। অফিসে ইদানীং একটি নতুন ষ্টেনো এসেছে। মেয়েটিকে বনমালীর মনে ধরেছে, তাই তার বসবার ব্যবস্থা হয়েছে স্বয়ং বড় সাহেবের ঘরে, একটু ফাঁক পেলেই বনমালী মিস সুরবালা সেনকে কাছে ডেকে গল্প সুরু করেন। অনেকদিন ধরেই গাঁথবার চেষ্টা হচ্ছে, মেয়েটিও এতদিনে টোপ গিলেছে মনে হচ্ছে। স্থির হয়েছে বনমালী তাকে নিয়েই কোথাও চেঞ্জে যাবেন! কাছাকাছির মধ্যে ওয়ালটেয়ার ভালো জায়গা, ওখানকার লোকগুলো অন্ততঃ গায়ে পড়ে গল্প করতে আসে না, আর একবার আর একটি টাইপিষ্টকে সঙ্গে নিয়ে গিছলেন,—সেবার মন্দ কাটেনি।

সুরবালা মেয়েটিও চমৎকার। বনমালী ভেবেছিলেন সপ্তাহখানেক উভয়ে একত্র কাটালে বেশ একটা চেঞ্জ হবে। সুরবালার কি ইচ্ছে কে জানে। হয়ত ভেবেছে চিরকালিক বাঁধনে বাঁধতে পারবে বনমালীকে।

কিন্তু কি যে হয়ে গেল কোথা থেকে, একদিন না কাট্‌তে সুরবালা নিঃশব্দে হোটেল থেকে সুটকেস নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে গেল। বনমালীর তখনও ঘুম ভাঙেনি। বনমালী ঘুম থেকে উঠে শুন্‌লেন এই দুর্ঘটনার কথা।

সংবাদপত্রের পাতায় যাঁরা বনমালী মজুমদারের ছবি দেখতে অভ্যস্ত তাঁরা ঘুম ভাঙার পর বনমালীর মুখের চেহারা দেখলে নিশ্চয়ই চিনতেই

পারতেন না। বিশ্বাসও করতেন না। দাম্ভিক বনমালী প্রথমটা কথাটা বিশ্বাস করতেই পারেননি। কিন্তু হোটেলের দারোয়ানটা রামজীর নাম নিয়ে দিব্যি করে ঐ কথাই বার বার বল্‌ল।

যে-বনমালীর মুখে ছিল দৃঢ়তা আর আত্মবিশ্বাসের ছাপ—সে মুখ এই মুহূর্তে আগুনের রঙে রাঙা—ক্রোধে, অভিমানে, ক্ষোভে, হতাশায় বনমালী ক্ষেপে গেছেন। ছোট ছেলের মত ঘরের জিনিসপত্র ভেঙে চুরে তচনচ করছেন।

কিন্তু রাগ পড়তেই আবার সেই শান্তসমাহিত ভঙ্গী।—'যাক্ গে, মরুক গে! যত সব—আমি যখন এসেছি তখন দুচার দিন না কাটিয়ে ফিরছি না।

সেদিন দুপুরে ঘরে বসেই লাঞ্চ সারলেন বনমালীবাবু,—সন্ধ্যার আগে ঘর থেকে বেরোলেন না। যখন বেরোলেন তখন মনে হ'ল বয়-বেয়ারা বাহ্যিক সৌজন্য প্রকাশ করলেও মনে মনে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

আবার তাঁর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল।

যাই হোক্ বনমালী তাঁর সেই পরিচিত সমুদ্রতীরে আপন মনে বেড়াতে থাকেন, মনে অনেক চিন্তা, আজ আর ব্যবসার কথাটা প্রধান নয়।

কার্তিকের প্রায় শেষ। এখন সিজন নয়, তাই ভীড় কম। অনেক চেঞ্জার চলে গেছেন, 'বীচ' একরকম খালি পড়ে আছে। কিন্তু দেখা গেল অদূরে একজন আসছেন,—বেশ পরিচ্ছন্ন বেশবাস,—মাথাটি নীচু করে ভদ্রলোক অতি মন্থর গতিতে হাঁটছেন। লোকটি নিজের চিন্তাতেই আকুল,—বনমালীবাবুর কাছ ঘেঁষে চলে গেলেন কিন্তু ওঁর মুখের দিকে তাকালেন না। বনমালীবাবু কিন্তু স্থির থাকতে পারলেন না, লোকটিকে তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন,...এ যে চেনামুখ। নিশ্চয়ই কোথাও দেখা হয়েছে কোনোদিন।

বনমালীবাবু সমুদ্রতীরে বেড়াতে থাকেন, ও কথা আর বিশেষ চিন্তা করলেন না।—সেই রাতে ডিনারের সময় কিন্তু আবার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। জানলার পাশের টেবিলটিতে একটি দম্পতি বসে কথা বলছিল, উনি পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় যে ভাবে চম্‌কে উঠ্‌ল তারা তাতে মনে হ'ল হয়ত ওঁর বিষয়েই কথা বল্‌ছে। বলুক গে। বক্-বক্ করছে, যেন দুটি পায়রা। যতো সব—কি এসে যায়?—তারপর নজর পড়্‌ল ঘরের কোণে, একলা বসে আছে সমুদ্রতীরের সেই লোকটি?

আহারান্তে সবাই বেরিয়ে এসে বাইরে বারান্দায় বস্‌লেন,—বনমালীবাবুও এলেন, আশা ছিল ঐ লোকটি কাছে এসে আলাপ জমাবার চেষ্টা করবে, লোকটি কিন্তু তা করল না, আলোচনাও ভেঙে গেল, সবাই একে একে যে যার ঘরে চলে গেল!

বনমালীবাবু লোকটার কথা ভুলে গিছলেন, সেই সময়টা সুরবালার কথা চিন্তা করছিলেন, কি অকৃতজ্ঞ মেয়েটা। ঘোর কলি! আজকালকার বাজারে পাক্ দেখি আর একটা এমন চাকরি। ফাঁকি দিয়ে জর্জেটের শাড়িখানা পেয়ে গেল—এখন হয়ত ভাব্‌ছে খুব চালাকি করেছি, আবার আমার কাছেই ছুট্‌তে হবে দুমুঠো অন্নের জন্যে।

পরদিন সকালে বাথরুমে দাড়ি কামাতে গিয়ে সেই লোকটির কথা আবার মনে পড়ল। সবে দাড়িতে সাবান লাগাতে যাবেন এমন সময় কথাটা হঠাৎ মনে জাগ্‌ল। হাতের ব্রাস মাটিতে পড়ে গেল, বনমালীবাবু আরশির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঠিক সে সময়েই একটা নিদারুণ শূন্যতায় তাঁর অন্তর আকুল আর্তনাদ করে উঠ্‌ল।

নেহাত-ই ক্ষণস্থায়ী সেই মনোভঙ্গী। বনমালীবাবু মনকে প্রবোধ দিলেন, মানুষের চেহারার অমন মিল থাকে সব দেশে। আকৃতিতে স্তালিন এবং হিটলারের 'ডবল' ছিল, চার্চিলেরও আছে। কার নেই? রাজা-রাজড়াদের ত' দুটো চারটে নকল থাকে। তবু বনমালী আয়নায় আর একবার মুখ দেখলেন—মনে মনে সমুদ্রতীরের সেই লোকটির মুখখানাও চিন্তা করলেন। হ্যাঁ—অপূর্ব মিল বটে।

তবে মুখে আমার মত দৃঢ়তার ছাপ নেই, চোখ দুটো আমার মত হলেও যেন একটু ছোট, নাকটাও ওঁর বড়, তবে আমার মত ছুঁচালো নয়—লোকটার মুখ দেখে বোঝা যায় অনেক ঝড়-ঝাপটা পার হয়ে এসেছে, আকৃতিতে একটা দৈন্য আছে।

এইভাবে কিছুক্ষণ আকৃতির তুলনা করে রায়বাহাদুর বনমালীর আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। ভালো করে দাড়ি কামালেন, তারপর ব্রেকফাষ্ট টেবলে গিয়ে বসলেন। আহারান্তে হলঘর থেকে বেরিয়ে হোটেলের অফিস ঘরে গিয়ে

ঢুকলেন, মাদ্রাজী কেরানী শ্রদ্ধাভরে উঠে দাঁড়াল, বনমালী সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন—ওদিকের ঘরটিতে যে বাঙালীটি একা থাকেন তাঁর নাম কি?

কেরানী তাড়াতাড়ি খাতাপত্র দেখে বল্‌লে—এই যে স্যার, জগদীশ পালচৌধুরী।

বনমালীর মুখে হাসি মিলিয়ে গেল। মনে আবার সেই নিদারুণ শূন্যতা জেগে উঠল।

বনমালীর ব্যবহারে এতটুকু অসঙ্গতি নেই। অনেকখানি হেঁটে মার্কেট থেকে এক শিশি হেয়ার টনিক কিনে নিয়ে এলেন। এক মুহূর্তও ভাবেন নি যে এর মধ্যে কিছু অতি-প্রাকৃত ব্যাপার আছে। কিন্তু এর ভেতর নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে।—হয়ত ব্ল্যাক মেল! আগেও এমন দু-একজনের সামনে পড়া গেছে, তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে, তবে এই সব পাজীদের এমন একটা উদ্ধত ভঙ্গী আছে যা মাইলখানেক দূর থেকেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই জগদীশ পালচৌধুরী লোকটা যেই হোক না কেন, এর মধ্যে তেমন কোনো ভাব নেই।

তবু ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময়, এখনই একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

সকালে সমুদ্রতীরে পৌঁছতে দেখা গেল একটা খালি বেঞ্চের একপাশে সেই লোকটি বসে আছে। পরিষ্কার হৈমন্তী আকাশ, মাঝে মাঝে হাওয়ার গতি প্রবল হয়ে উঠছে। রঙীন ছত্রধারী রায়বাহাদুর বনমালী মজুমদার লোকটির পাশে বসলেন—তারপর অকারণেই বলে উঠলেন—চমৎকার সকালটা না? এই সময়টাই ভালো।

লোকটি যেন চমকে উঠল, অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছে সে। যেন ঘুম ভেঙে উঠল—বল্‌ল—কি বল্‌লেন?

"বল্‌ছিলাম চমৎকার সকালটা।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, তা বটে—চমৎকার, চমৎকার।"

রায়বাহাদুর লোকটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর আবার নীরব রইলেন। লোকটার ত' কথা বলার কোনো চেষ্টা নেই, এও এক জ্বালা। বনমালীবাবু সন্দিগ্ধ চোখে লোকটিকে দেখতে লাগলেন, পোষাক-পরিচ্ছদ পুরাতন, জুতা অনেক ঘা খেয়েছে, সার্টের কলার ফাটা। চোখের দৃষ্টি করুণ, ভঙ্গী ক্লান্ত—যেন অনেক খেটে অনেক আঘাত পেয়ে এখানে জ্বালা জুড়াতে এসেছে। অথচ ঠিক এই হোটেলে থাকার মত অবস্থা মনে হয় না।

আবার বনমালীর মনে সেই শূন্যতা জাগে। বনমালী ভাবে আমি যদি অমন ভাবে সংসার থেকে সরে না আসতাম, আমারও এই হাল হ'ত। কিন্তু লোকটা কে! কেমন যেন ভৌতিক কাণ্ড!

বনমালীবাবু একটু কেশে বললেন—আমার নাম বনমালী মজুমদার।

লোকটা এমনভাবে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যেন কোনোদিন বনমালীর নামই শোনেনি। কেমন বোকার মত উদাস দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বল্‌ল—"ওঃ, বনমালী মল্লিক! নমস্কার।"

—মল্লিক নয় মজুমদার!

—মাফ্ করবেন—আমার নাম জগদীশ –

—পালচৌধুরী!

– আজ্ঞে হ্যাঁ!

আবার নীরবতা। একটা বিশ্রী মনোভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করল। যেন ঐ লোকটাই খাঁটি, আর উনি প্রবঞ্চক, প্রতারক।

তবু গলার স্বরে দৃঢ়তা এনে বল্‌লেনঃ অনেক দিন এসেছেন নাকি?

বেশ শান্ত গলায় লোকটি বল্‌লঃ না এই সপ্তাহখানেক একটু বিশ্রাম করতে এলাম, অনেক দিন ছুটি নেওয়া অদৃষ্টে জোটেনি।

"সারা জীবন খুব খেটেছেন, তা হ'লে?"

"তা করেছি! যথাসাধ্য করেছি!"

"দেশ কোথায়?"

"দেশ, বর্ধমানের দুর্গাপুর, তবে আমাদের জন্মাবধি বসবাস বালি—বেলুড়। ওদিকের কোনো আইডিয়া আছে?"

বনমালীবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকালেন, ব্ল্যাকমেলার হলেও হয়ত এই ভাবেই কথা বল্‌ত—কিন্তু লোকটার বলার ভঙ্গীটা বিভিন্ন। বনমালী মজুমদার রীতিমত চিন্তায় পড়েছেন। তার শরীরের স্নায়ু-শিরা যেন—ফেটে বেরিয়ে আস্‌তে চাইছে।

বনমালীবাবু বললেন—হ্যাঁ, বেলুড়, জানি বৈকি। মঠ রয়েছে। তা জায়গাটা কেমন?

—মন্দকি! বালিগঞ্জ ফালিগঞ্জের মত নয় বটে, তবে মন্দ নয়। তাছাড়া বাড়ির মত আর কি আছে, There's no place like Home!

—হুঁম্—আপনার নিজের বাড়ি? কি রকম বাড়ি? একতালা না দোতালা?

—তেমন বিশেষ কিছু নয়, তবে নিজস্ব বাড়ি, আমার স্ত্রী কিছু টাকা পেয়েছিলেন পিসীর কাছে, তাইতেই কিনতে পেরেছিলাম। এখনকার কাল হলে কি আর পারা যেত!

—ওঃ, কিনেছিলেন?

বনমালীর কণ্ঠস্বরে যেন একটা চাপা আর্তনাদ মেশানো রয়েছে। অপর লোকটির কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই।

লোকটি বল্ল—হ্যাঁ, তা ছোটখাটো অসুবিধা থাকলেও চল্ছে একরকম!

বনমালী মজুমদার তাঁর রঙীন ছাতাটি সুদৃঢ় হাতে চেপে ধরলেন, প্রভাতের সেই আতংক এখন যেন আবার এসে গলাটিপে ধরেছে। তিনি রেগে ফুলে উঠে লোকটির হাত চেপে ধরে বল্লেনঃ "স্কাউণ্ডেল, আমি তোমার মতলব বুঝেছি! আমি বনমালী মজুমদার, আমার ভয়ে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়, তুমি আমাকে ঠকাবে? এক পয়সাও পাবে না? একটি আধলাও নয়? আমার সর্বনাশ করতে এসেছ?"

অপর ব্যক্তি বনমালীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন, অত্যন্ত অসহায় দৃষ্টি!

অতিকষ্টে তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল—সত্যি বল্ছি মশাই, আপনার কথা একবর্ণও আমি বুঝ্তে পারছি না—কি বল্ছেন আপনি?

বনমালী মজুমদার উঠে দাঁড়ালেন, বল্লেন—বুঝেছ ঠিক, এইখানে বসে বসে সব কথা ভাবো—তবে বলে দিচ্ছি যদি কোনো হাঙ্গাম করার চেষ্টা করো তাহ'লে বিপদে পড়্বে, এমন অবস্থায় পড়্বে যা কল্পনা করতে পারো না।

এই বলে তিনি হোটেলের দিকে চলে গেলেন।

হোটেলে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বনমালী চিন্তা করতে লাগ্লেন—কি ভীষণ অবস্থা! শরীর অতিশয় খারাপ বোধ হচ্ছে, ডাক্তারকে ডাকলে হয়। একবার দেখানো ভালো।

এইভাবে চিন্তা করার সময় টেবিলের ওপর থেকে নানা জিনিস মাঝে মাঝে তুলে নাড়াচাড়া করেন বনমালী। সব চেয়ে মুশকিল বনমালীর আজ সর্বপ্রথম

মনে হ'চ্ছে—তিনি যেন আসল মানুষ নন। তাঁর টাকা, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি সব কিছুই তুচ্ছ। এই বিরাট মোটর, এই ব্যবসা, সবই যেন আজ এক আঁচড়ে ভেসে গেছে। ঐ লোকটাই যেন বিজয়ী হয়েছে সংসারের দ্বন্দ্বে, আর তিনি আজ পরাজিত হয়ে একপাশে পড়ে আছেন।

কিন্তু মাথা ভীষণ ঘুরছে, ভার্টিগো হ'ল নাকি? মনে হচ্ছে অনেক উঁচু থেকে যেন হঠাৎ পড়ে গেলাম।

বনমালীর এতদিনে মনে পড়ল অমিয়ার কথা, অমিয়ার ছুটি ছোট ছেলের কথা—অমিয়ার মৃত্যু সংবাদ সে পেয়েছে, তারপর কি হয়েছে, একমাত্র ছেলেটা কোথায় সে কথা কোনোদিন ভাবেন নি বনমালী। আজ সেই ছেলেটার কথা মনে হ'ল। ছেলেটা কোথায়। সেই নাকি? না তিনি গোপনে খবর পেয়েছেন—যুদ্ধের সময় মিলিটারীতে গিয়েছিল আর ফেরেনি। তা ছাড়া তার বয়স অনেক কম। সে কি করে এত বড় হবে! লোকটা ওঁরই বয়সী। নিশ্চয়ই ব্ল্যাকমেল করতে এসেছে।

কিন্তু মনকে এই বলে প্রবোধ দিলেও বনমালী জানেন, লোকটা ব্ল্যাকমেল করতে আসেনি—এ অন্য কিছু! ওঁর বিগতদিনের মৃত আত্মা আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে কি একটা হিসাব নিকাশ করতে চায়?

সমস্ত বিকাল, সমস্ত সন্ধ্যাটা তিনি ঘরেই রইলেন। অত্যন্ত বিশ্রী লাগছে নীচে নামতে ভরসা পাচ্ছেন না।

অনেক রাতে ঘুমালেন। তখন স্বপ্ন দেখছেন—যেন এরোপ্লেন থেকে পড়ে যাচ্ছেন, প্যারাসুট আছে বটে কিন্তু প্যারাসুট খুলছে না। ঘেমে নেয়ে বনমালী দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠলেন। সে রাতে কিন্তু আর ঘুম এলো না।

শুয়ে শুয়ে বনমালী ঠিক করলেন, কাল সকালেই লোকটাকে আবার ধরতে হবে। ওর জীবন বৃত্তান্ত ভালো করে শুনতে হবে। যে রাতে অমিয়ার টাকাটা নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন, সেদিন কি বাড়িতে তার অর্ধাংশ রেখে এসেছিলেন? একাংশ বাড়িতে বসে সংসার দেখেছে, অপরাংশ টাকা-রোজগার করেছে কলকাতা শহরে বসে! কিংবা পূর্ণাংশই বাড়িতে বসেছিল? বাকীটা স্বপ্ন,—মায়া মাত্র। একটা নিছক মনোবিলাস।

পরদিন সকালেও লোকটি সেইভাবেই বসে আছে বেঞ্চটার একপাশ ঘেঁষে। বনমালীকে লোকটি যেন দেখেও দেখল না। বনমালী কিন্তু আজ অন্য লোক, বিগতদিনের ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে বলেন—আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি! কালকের ঘটনা ভুলে যান। আমার শরীরটা ভালো নয়—হঠাৎ ব্রেকডাউন হয়েছিল আর কি! নারভাস ব্রেকডাউন। আপনি আমাকে মাপ করুন।

লোকটি মধুর হাসলো।

লোকটি বেশ ভদ্রগলায় বল্‌ল—ছিঃ ছিঃ—ওসব কথা ছেড়ে দিন,—এখন কেমন আছেন ?

বনমালী ওর পাশে বসে বললেন—কি জানি! দিন কয়েক লাগবে এখনও—

—তা বটে—তা জায়গাটা চমৎকার, বেশ শান্ত।

—হ্যাঁ, শান্তির জায়গা। সেই জন্যই ত' আসা।

—আমার অবস্থাও আপনার মত, আমি ঠিক বেড়াতে আসিনি।

বনমালী এতক্ষণে সোজা হয়ে বসলেন, তাহ'লে সত্যি কথা ক্রমশঃ বেরিয়ে আস্‌ছে দেখছি। বলে কি লোকটা! তিনি তার দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন—ওঃ!

লোকটি করুণ গলায় বলে—হ্যাঁ—সম্প্রতি আমার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে, তাই পালিয়ে এলুম।

বনমালীর মুখ শাদা হয়ে গেছে। সে অতিকষ্টে বলে—আপনার স্ত্রীর নাম কি অমিয়া ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি করে জান্‌লেন ?

—জানি, তা তিনি ত' থারটি নাইনে যুদ্ধ বাধার সময়েই মারা গেছেন!

—লোকটি বনমালীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, যেন বাতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তারপর বল্‌ল—আমার স্ত্রী মারা গেছেন—এখনও একমাস হয়নি। তারপর স্বপ্নভরা গলায় বলে, আত্মীয়পরিজন মারা যাওয়ার মত দুঃসময় আর নেই।

—থামুন—থামুন! আমি কোনো কথা শুন্‌তে চাই না।

লোকটি শান্তগলায় বল্‌ল—আহা! অমন করছেন কেন! চুপ করুন! ঠাণ্ডা হোন। আমি বরং আপনাকে হোটেলে রেখে আসি।

বনমালী বল্লেন—তুমি মিথ্যাবাদী, জোচ্চোর, তুমি কখনই জগদীশ নও। তুমি চঞ্চল, জানো।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বল্ল—"চঞ্চল পালচৌধুরী আমার ছেলে, যুদ্ধের সময় টামু রোডে সে মারা গেছে।"

বনমালীর মুখ ছাই-এর মত শাদা হয়ে গেল। সত্যই তিনি অতি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। লোকটি আবার বল্ল ঃ চলুন স্যার—আপনাকে হোটেলে রেখে আসি। সত্যি আপনার ডাক্তারকে দেখানোই উচিত।

—দূর হও! গেট আউট! বদমাইস্! জোচ্চোর!—

লোকটি চলে গেল—বনমালী চুপ করে বেঞ্চে বসে রইলেন।

অনেক পরে বনমালী হোটেলে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে রইলেন, ভাবতে থাকেন শুধু যদি লোকটা চলে যায়, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিক। নিশ্চয়ই ওর মতলব খারাপ। সারা সন্ধ্যা সেই ভাবে বিছানায় কাটলো বনমালীর। হঠাৎ মনে হ'ল লোকটির সঙ্গে আর একবার দেখা করে বাকীটা শোনা প্রয়োজন। ডিনার টেবলে বসার আগে ওর সঙ্গে আর একবার দেখা করা দরকার। বনমালী একজন বয়কে ডেকে বল্লেন—একবার ঐ মিঃ পালচৌধুরীকে ৯ নম্বর ঘর থেকে ডেকে আনতে পারো?

বয় বল্ল—জি হুজুর!

ঠিক সেই সময়েই দেখা গেল মিঃ পালচৌধুরী ডাইনিং হলের দিকেই আসছেন।

বনমালী এগিয়ে গিয়ে বলেন—মাফ করবেন—আপনার সঙ্গে একটু দরকারি কথা ছিল।

লোকটি অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল—না, আপনার সঙ্গে আমি কোনো কথাই বলতে চাই না। আপনি বার বার ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। আমি ঠিক এইখানে আবার একটা সীন ক্রিয়েট করতে চাই না।

—কিন্তু দেখুন, কয়েকটা কথা জানতে চাই—আপনি যা চান দেব, যত টাকা চান—

লোকটি অত্যন্ত ঘৃণাভরে পাশ কাটিয়ে ডাইনিং হলে চলে গেল। বনমালী তার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

বয়টা তখনও সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। বনমালী হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে

চীৎকার করে উঠলেন—হাঁ করে কি দেখছিস,—জলদি আমার জিনিসপত্র বার করে নিয়ে আয়।

বয় তবু তাকিয়ে আছে, বনমালী দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন, এই হোটেলে আর নয়। এই মুহূর্তেই তাকে যেতে হবে।

নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলেছেন বনমালী! ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে চলেছে তাঁর বিরাট De Soto গাড়ি। লরী, বাস, গরুর গাড়ি ট্রামে কণ্টকিত-পথ। গাড়ির বেগ বাড়ছে না। বনমালীর মাথায় আজ আকাশ ভেঙে পড়েছে। এখনই বেলুড় থেকে সংগ্রহ করতে হবে প্রকৃত তথ্য। স্বয়ং খোঁজ খবর নিয়ে দেখবে। কে তাঁকে চিনতে পারবে? টাক, দাড়ি আর বয়স আজ থেকে কুড়ি বছর আগেকার জগদীশকে মুছে দিয়েছে।

কিন্তু হাওড়া ব্রীজে ওঠার মুখেই একটা বিশ্রীকাণ্ড ঘটে গেল, একটা নির্বিকার ধর্মের ষাঁড়কে পাশ কাটাতে গিয়ে প্রকাণ্ড এক লরী সোজা ডি-সটোর ওপর এসে পড়ল। ছিটকে গেল বনমালী, চুরমার হ'ল তার ডি-সটো, তার জীবনস্বপ্ন, তার ব্যবসা, আর টাকা।

গত সপ্তাহে মোটর দুর্ঘটনার মোট সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ, এবার সেটি বেড়ে পুরোপুরি পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বনমালীর বিচিত্র কর্ম-জীবনের ইতিহাস সকলেরই চোখে জল জল করে ফুটে উঠল।

কফি হাউসের একপ্রান্তে ছোট্ট টেবলে দুজনে মুখোমুখি বসে কথা হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। একজন রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমার তিন নম্বরের অভিনেতা, আর একজন সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত সুপ্রীম কোর্টে পরাজিত কেমিষ্ট।

অভিনেতা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে গম্ভীর গলায় বললেন—মেরা ইনাম? কেমিষ্ট তার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন কিছুই বোঝেনি।

অভিনেতা আবার বল্‌ল—'বকশিশ'! কি চুপচাপ যে! এমন অভিনয় আমি জীবনে করিনি, আর করবোও না। কে বলে আমার অভিনয় ক্ষমতা নেই? এমনটি আর কেউ পারবে?

কেমিষ্ট ভয়ে ভয়ে এবার জবাব দেয়—কিন্তু আমার যে কিছুই নেই।' আপনি আমাকে মাফ করুন।

অভিনেতা এবার উদাসীন ভঙ্গীতে উদার কণ্ঠে বল্‌ল—বহুৎ আচ্ছা। পয়সা যে আপনার নেই তা আমি জানি, দুবেলা আহার জোটে না তাও জানি, তবু কেন আজ একাজে হাত দিয়েছিলুম জানেন?

—কি জানি? অকারণ?

—অকারণ নয় বন্ধু, অকারণ নয়। এই পার্ট আমার অনেক দিনের রিহার্সেল দেওয়া পার্ট। এ অভিনয় আর কাকে দেখাতাম। বনমালী শুধু আপনাকে ঠকায়নি, জগদীশরূপে আমার মাকেও ঠকিয়েছে। টাকা ছাড়া সংসারে আর ওঁর আপনার জন নেই।

অভিনেতার চোখের কোণ এতক্ষণে সজল হয়ে উঠেছে।

শিশু

আশ্রমের সুপারিন্‌টেন্‌ডেনট্‌ ভবতারিণী মা অবশেষে বেশ প্রশান্ত ভংঙ্গীতে বললেন ঃ এইবার ছবিরাণী, তুমি বাড়ি যেতে পারো। বেশ সহজভাবে থাকবে মা, মনটাকে শক্ত করবে, ভাববে এসব কিছুই হয় নি।

ভবতারিণী মা'র বেতের চেয়ারের হাতলটি কঠিনভাবে ধরে অতি মৃদু গলায় ছবি বলল ঃ সে আমি পারব না মা, আমার বাবা কিছুতেই চৌকাট মাড়াতে দেবেন না, তিনি কঠিন লোক, আমি তাঁর একমাত্র মেয়ে হলেও তাঁর স্নেহ আর পাব না—

ভবতারিণী মা ছবির মাথায় হাত দিয়ে বললেন—পাগ্‌লী, বাপেরা অমনিই হয়, কিন্তু তোমার মার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তিনিই বলেছেন তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতে। এ সুযোগ সবাই পায় না, তোমার ছেলের ভার আশ্রমের হাতে রইল।

ছবিরাণী সাহস সঞ্চয় করে বলল ঃ আশ্রমে আমি একটা কাজ পাই না মা ? তাহলে আমার ছেলেকে নিয়ে ত' এখানেই থাকতে পারি।

ভবতারিণী দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন, বললেন—না, এখনও সময় হয় নি, তোমাকে আরো শক্ত হতে হবে, আরো একবছর তোমার ওপর আমরা নজর রাখব, যদি দেখি তুমি আশ্রমের উপযুক্ত, তবেই তুমি আশ্রমে থাকতে পারবে, নইলে নয়। আমাদের আশ্রমের আইন ত' জানো !

হেমাঙ্গিনী মা পাশেই বসে শুনছিলেন, বললেন, বরং তুমি বাড়ি ফিরে যাও, যেখানে কাজ করছিলে সেখানেই বেশ সহজভাবে কাজ করগে যেন এসব কিছুই হয় নি। ছেলে তোমারই রইল, তুমি যদি কোনদিন চাও তবে ফেরৎ পাবে—

এরপর ছবিরাণী আর কি করবে। চোখ মুছতে মুছতে বাড়িতেই ফিরে গেল।

বাড়ি ফিরে অতীতের কথা ভোলবার চেষ্টা করে। মনে রাখাও যেমন কঠিন কাজ, ভুলে যাওয়াটাও তেমন সহজ নয় মোটে। মা তাকে সহজভাবে গ্রহণ করেছেন, কোন প্রসঙ্গ তুলে খোঁচা দেন না, ভোলবার ও ভোলাবার চেষ্টাই তাঁর বেশী। মাঝে মাঝে আরো সহজ হবার জন্য দক্ষিণেশ্বর বা কালীঘাটে নিয়ে যান ছবিকে। মন থেকে সব ধুয়ে মুছে নূতন শ্লেটে আবার নূতন অঙ্ক করো। মার সঙ্গে একত্রে থাকা বরং ভালো, কেমন একটা শান্তি ও স্বস্তির ভাব মনে জাগে।

কিন্তু বাবা! সেই যে চুপ করে আছেন মুখে আর কথাটি নেই! ছবিকে এড়িয়ে চলেছেন সবদিক থেকে। একগ্লাস জলও তার কাছে চেয়ে নেন না কোনোদিন। অফিস থেকে এসে কোটটি খুলে ছবির কাছে এসে বসতেন, নানা আলোচনায় সময় কাটতো বেশ। এখন যেন শ্রাবণের মেঘের মত থমথম করছে দিনরাত, কখন যে বর্ষণ হবে তার স্থির নেই। মুখের কাঠিন্য ভেদ করে মনে প্রবেশ করা শক্ত, তবু মনে হয় ঝড় উঠলেই হ'ল।

ছবি ভাবে তার বরাত ভালো, কত মেয়ের বাপ ত' এ সব ক্ষেত্রে তাদের বাড়িতেই জায়গা দেন না, তবু ছবির বাবার মত গোঁড়া মানুষটি সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে আছেন। সেই সব মেয়েদের ত' সারাজীবন অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। এই ধরনের দু-একটি ঘটনা ত' তার নিজেরই জানা আছে।

দিন কিন্তু কেটে যায়—

বাড়ি তেমনই থমথমে। সেই সকালে উঠতে হয়, যথারীতি সংসারের কাজ সারতে হয়। বাড়ীতে ইদানীং ঝি নেই! তারপর ভিড় ঠেলে ট্রামে বাসে উঠে যথাসময়ে ডালহৌসী স্কোয়ারের সেই, সমুদ্র সদৃশ বিশাল সরকারী অফিসের সদর দপ্তরে প্রবেশ ও পাঁচটার পর অনুরূপ অবস্থায় বাড়ি ফেরা।

মা সারা সময়ে রান্না ঘরে আছেন, বাবা যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন খবরের কাগজ মুখে করে বসে থাকেন, নইলে সেণ্ট জেমস স্কোয়ারের সেই সনাতন বেঞ্চে বসে সাড়ে ন'টা বাজিয়ে তবে বাড়ি ফেরেন। সেই বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতা।

দেখতে ঠিক সেইরকম হলেও, একটু তফাৎ আছে বৈকি! তফাৎ ঘটেছে অন্তরে,—মন একেবারে ভেঙেচুরে টুকরো হয়ে গেছে। ডিমের মুখ ভেঙে শাঁস বার করে নিলে তার ভেতর আর কি থাকে? ছবিরাণী যেন এখন ডিমের

খোলা, ভেতরে তার কিছু নেই। একটা অদ্ভুত লঘু দেহভার তার কাছে বিচিত্র লাগে—শুধু যে ছেলেটা তার কাছ থেকে সরে গেছে তা নয়, দেহটাই কেমন যেন লঘু হয়ে গেছে।

অনেক সময় মাথার চুল আঁচড়াতে গিয়ে মধ্যপথে থমকে থেকে গেছে ছবিরাণী, ভেবেছে, কি দরকার চুল বাঁধবার। প্রসাধন পারিপাট্যের প্রয়োজন কি, এলবার্ট ভঙ্গীতে সামনের চুল উঁচু না করে যদি সোজাসুজি টান করেই আঁচড়ায়, কি এসে যায় তাতে? অন্ততঃ ছবিরাণীর তাতে কিছু এসে যায় না, যার সব গেছে তার কিছু এসে যায় না, যার সব গেছে তাকে ভালো দেখতে হলেই বা কি, মন্দ দেখতে হলেই বা কি। বরং বোকামি! রূপ ও সৌন্দর্যে তার আর কি প্রয়োজন!

আগেকার দিনে ছবিরাণীকে যে দেখেছে এখন তাকে দেখলে সে শুধু অবাক হয়ে যাবে তা নয়, তাকে অনেক কষ্ট করে বুঝতে হবে এই সেই মেয়ে।

অফিসে কানাকানি হয়। মেয়েকর্মীদের চাপা হাসি ও পুরুষ কেরানী মহলে বিদ্রূপ ও ইংগিতের অভব্যতা ছবিকে আগে আগে উৎপীড়ন করে তুলত। এখন সবই মুখ বুজে সইছে! বাপের বয়সী বুড়ো বড়বাবুও মাঝে মাঝে দু'একটি সরস কথা বলে ফেলেন। এবং বলেই বয়সের দোষে, কথার আঁট নেই বলে একটু কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশও করেন। ছবিরাণী নীরবে সয়ে যায়। তার অজ্ঞতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে যে উচ্ছৃঙ্খল দায়িত্বহীন পশু এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে সে আজ প্রমোশন পেয়ে সাহেবের ঘরে বসছে, নিত্য নূতন পোষাক পরে পা ফাঁক করে সিগ্রেট টানছে। কেউ তাকে বিদ্রূপ করে না, কোনদিন হয়ত তাকে তিরস্কারও করে না। এমনই সমাজ ব্যবস্থা। ছবিরাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কষ্ট কিন্তু অন্যখানে। সব কিছু ভুলে, যেন কিছুই হয় নি, এই মিথ্যার অভিনয় আর চালিয়ে যেতে পারে না ছবিরাণী—কি করে সে ভুলবে সন্তানকে, যাই হোক সে ত' তার মা!

অফিসের লোকেরাও অভিনয় করে চলেছে, যেন তারাও কিছু জানে না। একদিন ত' পদ্মা তাকে সোজাসুজি বললে—একাউন্টস্ সেকসানে কিশোরী মিত্তির স্পষ্টই বলছিল—ছবিরাণীর যে ছেলে হয়েছে তা নাকি সবাই জানে।

আর একদিন শেফালী চাটার্জি বললে: জানিস ছবি—মলিনাদি বলছিলেন—ছবি দত্ত যে সবাইকে ন্যাকা মনে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আসল কথা কে না জানে?

কিন্তু সরাসরি কেউ এসে প্রশ্ন করে না, ছবির গাম্ভীর্যে তারা স্পষ্ট কথা বলতে বোধ হয় ভয় পায়। ছবিরাণীর মনে দিন রাতই সমস্ত ঘটনাটি কাঁটার মত বিঁধে থাকে।

একদিন রাতে সে মার কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। আমি যে আর চাপতে পারি না মা—আমার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সে রাতে অনেক কষ্টে তবে মা তাকে ঠাণ্ডা করেছিলেন।

যাই হোক, ছবির ভাগ্য ভালো, মায়ের কোলটাও যে যায়নি, একি কম সৌভাগ্য। এ আশ্রয় কোথায় মিলত ?

হঠাৎ জুলাই মাসের শেষে কিছু টাকা হাতে এসে গেল, দু'বছর আগে মাগ্‌গী ভাতার হিসাবে ভুল হয়েছিল, সেই পাওনা টাকাটা এতদিন পরে পাওয়া গেল। প্রায় একবছর পরে এই প্রথম একটা নূতন কথা মনে হ'ল ছবিরাণীর। আজ শনিবার, এখনই বেরিয়ে পড়লে সোদপুরে আশ্রমে গিয়ে ছেলেটাকে দেখে আসা যায় কেউ টের পাবে না। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবে, খরচও পাঁচ-ছ' আনার বেশী নয়।

বিকেলটা সত্যি চমৎকার কাটল—এতটুকু অভিনয়ের মুখোশ নেই, আমার খোকা, আমার বাবলু বলে ছেলেটাকে কোলে করে আদর করা গেল, কেমন রং খুলেছে।

হেমাঙ্গিনী মা বললেন, মার চেয়ে ওর রং ফরসা হবে। ভবতারিণী মা কাশীর আশ্রমে চলে গেছেন, ছবিরাণী জানত না, হেমাঙ্গিনী মা বকতে লাগলেন এতদিন না আসার জন্য, মুখপুড়ি বাচ্চাটার জন্য তোর মন কেমন করে না ?

মন কেমন করে মা দিনরাত, লজ্জা আর ঘৃণায় আসতে পারি না।

থাম থাম লজ্জাটা কিসের ? ওকি তোর ছেলে ? এখনও আমাদের ছেলে, উমাকেই দেখবি মা বলে ডাকবে শেষটায়। ওর কাছেই ত' রয়েছে দিন রাত। ওঃ উমা, ছবিকে একটু চা-টা দে না, ও আবার কোলকাতার মেয়ে—

হেমাঙ্গিনী মা'র হাতে মাগগী ভাতার পুরো টাকাটা দিয়ে দিল ছবিরাণী।

তিনি সবিস্ময়ে বললেন এত টাকা হঠাৎ দিলি যে ! ছবি বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে হাসতে লাগল। হেমাঙ্গিনী মা বললেন—তোদের সংসারে দরকার হবে না ? দিয়ে দিলি যে সবটা।

—ও টাকা পাওয়ার ত' কোনো আশা করি নি মা।

—বেশ করেছিস মা। আবার আসছে শনিবার আসবি। লজ্জা কিসের। মাঝে মাঝে বাচ্চাটাকে দেখলে মনটায় শান্তি পাবি।

উমা এসে চা দিয়ে গেল, সেই সঙ্গে বাবলুকে তুলে নিয়ে গেল, দুধ খাওয়াবার সময় হয়ে গেছে!

এইভাবে প্রতি শনিবার যাতায়াত চলল। ছবিরাণী—মার কাছে লুকোয়নি কোনো কথা। শনিবার দিনটা তাই মায়ে ঝিয়ে বাবলু প্রসঙ্গেই কেটে যায়।

অবশেষে একদিন গোলাপী উল এল।

আগে কেউ লক্ষ্য করেনি জিনিসটা। মা কখন দুপুরের দিকে বেরিয়ে বৌ-বাজার থেকে কিনে এনেছেন উলটা নিজের পছন্দ মত। একদিন ছবিরাণী ধরে ফেলল ব্যাপারটা। বললে কি করবে এতে!

—কেন কোট সোয়েটার।

—মাপ পাবে কোথায়?

—আন্দাজে। একবছরের ছেলের একটা আন্দাজ নেই? তা ছাড়া আমার কাছে একটা প্যাটার্ন আছে।

—কই দেখি?

বালিশের তলায় সযত্ন রক্ষিত পাতলা বই "সচিত্র উলের কাজ বের" করে মা বললেন: এই দেখ, কেমন মানিয়েছে ছেলেটাকে!

ছবিরাণীর চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল, সামনে গিয়ে বলে: গলার ধারে ফুল দুটোও করবে? বেশ হ'বে। এমন রঙ হয়েছে মা!

হবে না? তুই ও ত' ছোটবেলায় অমনই ছিলি। যা মা উনুনটা ধরলো বোধ হয়—কেটলি বসিয়ে দিয়ে আয়, সাড়ে পাঁচটার ভেতর চা না পেলে আবার কুরুক্ষেত্র বাধবে।

তা আর জানি না?—ম্লান কণ্ঠে জবাব দিয়ে উঠে যায় ছবিরাণী। মা স্বীকার করে নিয়েছেন, কোথায় এক এক প্রান্তে ছবিরাণীর ছোট খোকা বাবলু বসে আছে। কিন্তু বাবা তা সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে চান, কোন চিহ্ন কোথাও থাকে এ বাবা চান না! হৃদয় যদি কাঁদে নীরবে কাঁদুক। ব্যথা ও যন্ত্রণায় যদি আকুল হয়ে থাকো এমনই মরো, চেঁচিয়ে উঠো না যেন। বাড়িতে থাকতে দেওয়ার পূর্বে এ সব কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন ছবির বাবা।

অনেকগুলি শনিবার কেটে গেল। ছবিরাণী একদিন গিয়ে বাবলুর কোট সোয়েটার পরিয়ে এসেছে। তারপর টুপি ও মোজা। মা ক্রমে ক্রমে সে সব তৈরী করে দিয়েছেন।

মা বললেন ঃ হ্যাঁরে, বাবলুর টুপিটা ছোট হয়নি তো ?

—না মা, চমৎকার মানিয়েছে, চুলগুলো বেরিয়ে থাকে বলে আরো ভালো দেখায়।

এক সপ্তাহ পরে মার হাতে আবার নূতন রঙের উল দেখে ছবি প্রশ্ন করল ঃ এ সব আরার কি করবে মা ?

—আর একটা বুনবো। ভাবছি, হু'সেট থাকা ভালো। আচ্ছা ছবি, ওরা উলের জিনিস করতে জানে তো ?

নীল রঙের কোট সোয়েটার তৈরী হয়ে গেল। হঠাৎ সেটা নিয়ে দেখতে দেখতে মা বলেলন ঃ আমার ইচ্ছে করে একবার বাবলুকে দেখি।

—বেশ ত' চলো না মা, সামনের শনিবার আমার সঙ্গে।

মা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন ঃ তা হয় না, তাহলে আর ভাবনা কি ছিল।

ছবির বাবা জগদীশবাবু প্রতি অমাবস্যায় শ্রীরামপুরে গুরুদেবের কাছে ছোটেন ! ঠিক হ'লো সেদিন বাবলুকে নিয়ে আসা হবে, ষ্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে নেবুতলা এক টাকার বেশী লাগবে না।

সবটা বেশ সহজভাবেই ঘটল। কিন্তু শিয়ালদা ষ্টেশনে এসে পৌঁছুতেই অসময়ের বৃষ্টি আকাশ ভেঙে পড়্‌ল। ট্যাক্সিওলা সযত্নে বাড়ি নিয়ে এলো। বৃষ্টির আবরণে শিশু কৃষ্ণের মতো জগদীশবাবুর নেবুতলার বাসা বাড়ীতে বাবলুর আগমন হ'ল। কাকপক্ষীও টের পেল না

বাড়ীতে ঢুকতেই মা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাবলুকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন—আমি সেই অবধি ঠাকুরকে ডাকছি। ভিজে গেছিস খুব, যা কাপড়টা ছেড়ে আয়। আমি বাবলুকে দেখছি।

বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে দেরি থাকলেও মনে হচ্ছে যেন অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে আলো জেলে দিতে হয়েছে।

ছবিরাণী একটা ফিডিং বোতল আগে থাকতেই কিনে এনেছিল, সেইটিতে দুধ ভরে নিয়ে এল। মা বললেন—তুই পারবি না, আমাকে দে—

দুধ খেতে খেতে বাবলু ঘুমিয়ে পড়ল। মা বললেন এক কাজ কর। বিছানার এক পাশে শুইয়ে দে, বেশীক্ষণ কোলে থাকলে আবার জেগে পড়বে।

ছবিরাণী হঠাৎ সেই বৃষ্টির ভেতর কি যেন শুনতে পেয়ে বল্লে—মা শুনছ? মা পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সিঁড়িতে যার জুতোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে সে ব্যক্তি জগদীশবাবু ভিন্ন আর কেউ নয়।

একটু পরেই দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ালেন জগদীশবাবু, সারা অঙ্গ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে, ভিজে ছাতাটা একপাশে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, ঘুমন্ত বাবলুকে তাঁর চোখে পড়েছে। ছবিরাণী ও তার মা থর থর করে কাঁপছে, এখনই একটা অঘটন ঘটবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

জগদীশবাবু বেতের মোড়ায় বসে কোটটা ছেড়ে ফেললেন, তারপর জুতো খুলতে খুলতে বললেন ঃ হুঁ অতিথি,—অতিথি নারায়ণ! দেখি এদিকে নিয়ে এস—

মা বললেন—তোমার গা বেয়ে জল পড়ছে। বাবলু ভিজে যাবে যে! ছবিরাণী ভয়ে ভয়ে বলে, আমি এখনই ওকে দিয়ে আসব বাবা।

জগদীশবাবু কিন্তু এসব কথা শুনছেন না, যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন, মুখ চোখের ভাব যেন কেমনতরো, অন্য রাজ্যে চলে গেছেন যেন, হাতদুটি বাবলুর দিকে এগিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু হাত তাঁর কাঁপছে।

জগদীশবাবু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন ঃ ছেলে কি আর আমি কোলে করি নি কখনও, দাও দেখি—

মা নীরবে বাবলুকে জগদীশবাবুর হাতে তুলে দিলেন! বোধ করি এই নড়া-চড়ায় বাবলুর ঘুম ভেঙে গেল! অপরিচিত পরিবেশে সে সহসা চীৎকার করে কেঁদে উঠল—

জগদীশবাবু কিন্তু বেশ প্রশান্ত ভঙ্গীতে পিঠে হাত চাপড়িয়ে বললেন ঃ চিনতে পেরেছিস দেখছি....

আশ্চর্য! শিশুর কান্না সহসা থেমে গেল, সে জগদীশবাবুর গোঁফ ধরে টেনে খেলা সুরু করে দিল।

—আরে এ ত' কম নয়।

ওদিকে রাত ঘন হয়ে এসেছে। বৃষ্টির বিরাম নেই, জানলার ওপর ঝাপটা এসে লাগছে—বাইরের অবস্থা যেন ক্রমেই খারাপ হচ্ছে—

ভীতচিত্তে ছবিরাণী আবার বললে ঃ এবার ওকে রেখে আসি বাবা!

রেখে আসবি! কোথায় রেখে আসবি এই ঝড় জলে? ও যখন এসেছে তখন এখানেই থাকবে।

মা ও ছবিরাণী জগদীশবাবুর এই নাটকীয় অভিব্যক্তিতে অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

আয়না

ঊর্মিলার মনে পড়ল প্রেমের সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি এই যে এক পক্ষের চেয়ে অপর পক্ষের ভালোবাসাটাই সব সময় অধিকতর গভীর মনে হয়।

রেশম-কোমল চুলগুলির ওপর কঠিন ব্রাস ঘষছিলো ঊর্মিলা, সাতাশ, আটাশ, ঊনত্রিশ—প্রতিদিন গুণে একশো বার চুলের ওপর ব্রাস চালানো উচিত, বিলাতী মাসিকের পাতায় এই রকম একটা কথা পড়েছিল। ব্রাসের চাপে চুল সায়েস্তা রাখা যায়, কিন্তু স্বামী? স্বামীকে সে কি দিয়ে বাঁধবে? মৃণাল ভুজের বাঁধনই কি যথেষ্ট! পুরুষকে কখনও স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতে নেই, বিশেষতঃ স্বামীকে। রাশ একটু আলগা পেলেই অপরার কণ্ঠলগ্ন হয়ে মাকড়সার জালে বাঁধা পড়তে কতক্ষণ। সাতচল্লিশ·· আটচল্লিশ···ঊনপঞ্চাশ··· চতুর্দিকেই মেয়ে আর মেয়ে—

ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়ে আছে সেই রঙীন খামখানা, মেয়েলী ছাঁদে মোটা মোটা অক্ষরে জয়দেব চৌধুরীর নাম লেখা। এই খামখানাই সারা সন্ধ্যাটা বিষিয়ে দিয়েছে, গভীর মর্মবেদনার কারণ হয়েছে। এমন সুরভিসিঞ্চিত খামে কোন নারীর মায়া-ভরা আকুলতা মিশিয়ে আছে কে জানে, কি প্রয়োজন তার জয়দেব চৌধুরীকে?

মন বলে ওঠে এতটা ঈর্ষা ভালো নয় ঊর্মিলা, যা রাখতে চাও তা যে নিজেই হারাতে বসেছ। তিন বছরের বিবাহিতা জীবনের পর এই মনোভাব সত্যই অহেতুক। কিন্তু জয়দেবের ঐ বরতনুর দিকে তাকালে কোনো কিছুই অহেতুক মনে হয় না। রমনীর চোখের ভাষা রমণী বলেই ঊর্মিলা অতি সহজে বুঝে নেয়, এমন কি একদিন জয়দেবের চোখেও কেমন যেন রসগ্রাহীর মোহিত দৃষ্টি সে লক্ষ্য করেছে।

যা আমাদের আছে তা হারাবার ভয়ই হ'ল ঈর্ষা, জয়দেব একদিন কথাটা বলেছিল। কথাটা সত্য বটে। এই কথাটা মনে পড়ার সঙ্গেই আবার মনে

হ'ল, প্রেমের সব চেয়ে মর্মান্তিক ট্রাজেডি এক পক্ষ অন্যকে বেশী করে ভালোবাসে কিন্তু যার ভালোবাসা অগভীর তার কিছু হারাবার ভয় নেই, তাই অত-শত চিন্তা নেই। জয়দেব একাধিকবার বলেছে তার মনে কখনও এতটুকু ঈর্ষা নেই, কে জানে তার কি মানে? উর্মিলাকে হারালেও হয়ত তার কিছুই এসে যায় না।

বাইরে পদধ্বনি ও সেই সঙ্গে দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। হাত থেকে ব্রাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে উর্মিলা পিছন ফিরে তাকাল। জয়দেব এতক্ষণে ফিরল…

উর্মিলা বলে উঠল—"এত দেরী যে? সেই কখন থেকে বসে ভাবছি, খাবারও সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল বোধ হয়, যা শীত পড়েছে আজ—"

এ সব কথার জবাব না দিয়ে ড্রেসিং টেবিল থেকে খামখানা তুলে নিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করে জয়দেব—"এ আবার কখন এল?"

উর্মিলা শুক্‌নো গলায় বলে—"বিকালের ডাক।" সংক্ষিপ্ত জবাব।

জয়দেব তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়ে পকেটেই রাখল। আরশির ভিতর দিয়ে পিছনের এই দৃশ্য সচেতন উর্মিলার নজর এড়ালো না।

একটু পরে জয়দেব বলল—"খাবার যদি তোমার ঠাণ্ডা হয়েই থাকে, আমি না হয় তাড়াতাড়ি কাপড়-জামা ছেড়ে আসি।"

সেদিন রাতের খাওয়ার ব্যবস্থাটা ভালোই হয়েছিল আর জয়দেবের মেজাজও ছিল আশ্চর্য রকম ভালো। সারা দিনের কাজের হিসাব, কার সঙ্গে কি কথা হ'ল, এমন কি সামনের ছুটিতে ক'দিনের জন্য ওয়ালটেয়ার বা গোপালপুর যাওয়া যাক—এই জাতীয় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হ'ল; কিন্তু সকল কথার ফাঁকে উর্মিলার মন প'ড়ে আছে পকেটের সেই নীল খামটিতে। কে জানে এ আবার কোন্ মেয়ে জয়দেবকে চিঠি লিখল?

বাকী সময়টুকু নিরিবিলিতে চুপচাপ কাটলো, জয়দেব সকালের সংবাদপত্র আর উর্মিলা অর্ধ-সমাপ্ত সোয়েটারে মনোনিবেশ করল। সেদিনের কাগজে তেমন চাঞ্চল্যকর কিছু ছিল না, তাই জয়দেব কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে শুতে চলে গেল, উর্মিলার সোয়েটারটা তাড়াতাড়ি শেষ করা প্রয়োজন, তাই সে বসে রইল।

অনেকক্ষণ পরে উর্মিলা সেলাই ছেড়ে উঠল, ঘরের আলো নিবানো,—বাইরের দালানটায় সবুজ আলোটা জ্বলছে, সারা বাড়ি নিঝুম। উর্মিলা এদিক ওদিক তাকিয়ে আনলার ওপর 'হ্যাঙ্গারে' টাঙানো জয়দেবের কোটটি সন্তর্পণে তুলে নিয়ে পকেট থেকে সেই নীল খামটা বার করল। তার হাত থরথর করে কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, (কারণ উর্মিলা এটুকু জানে যে কাজটা গর্হিত, স্বামীর চিঠিপত্র স্ত্রীর পড়া উচিত নয়, আর কেউ এ কাজ করলে উর্মিলা কি বলত তাকে)—সামনের ঘরেই শুয়ে রয়েছে জয়দেব ? বেশ জোরে যেন তার নাক ডাকছে। এই নিরাপদ অবসরে খামখানি খুলে ফেলল উর্মিলা, কাগজটা বেশ বড় কিন্তু লেখা আছে মাত্র তিন ছত্র ঃ

আগামী শনিবার 'ভারতশ্রী'তে আমাদের চ্যারিটি সো, সন্ধ্যা ৬-টার পর। আপনাকে মনে করিয়ে দিলুম। গভর্ণর ছ'টা বাজতে পাঁচের মধ্যেই আস্‌বেন, কিন্তু আপনি একটু আগে আস্‌বেন, রিসিভ করবেন আপনি। ইতি

গায়ত্রী দত্ত

অতি সাধারণ, রসকষহীন শাদা চিঠি, হয়ত জয়দেবকে ধরেছে, ঐ ত' মানুষ, একটু ভালো করে ধরতে পারলেই হ'ল। উর্মিলার সারা শরীরে একটা স্বস্তির হিল্লোল খেলে গেল। ধীরে ধীরে সে খামখানি পকেটেই রেখে দিল।

—"একেবারে যে রবার্ট ব্লেক হয়ে উঠলে দেখছি, রীতিমত গোয়েন্দাগিরি !"

চমকে পিছন ফিরে উর্মিলা দেখল দরজার চৌকাঠে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে জয়দেব।

কি বলবে উর্মিলা, কি আর বল্‌তে পারে, ধরা-গলায় বল্‌লে—"এই ত' নাক ডাকছিলো তোমার—"

বিষয়টি লঘু করাই তার উদ্দেশ্য।

—"অর্থাৎ বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই গোয়েন্দাগিরি করতে চেয়েছিলে"—জয়দেব বাঘের মত সজোরে এসে ধরল উর্মিলাকে।

উর্মিলা কেঁদে উঠল, ফুঁপিয়ে কান্না—অনেক কষ্টে শুধু বল্‌ল—"আমারই দোষ।"

জয়দেবের বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে এল, বেশ কোমল গলায় বল্‌ল—"দোষ সকলেরই হয়, তবে রোগে না দাঁড়ায়। এসো, শোবে এস,—মাথাটা ঠাণ্ডা হয়েছে ?"

বিছানায় শুয়ে হাই তুল্‌তে তুল্‌তে জয়দেব বল্‌ল, ভাগ্যিস্ আমার অত-শত নেই—"

—"তার মানে?"

—"আজ কার সঙ্গে দেখা হ'ল জানো, তোমার সেই মতি সেন?"

—"সে ফিরেছে নাকি?"

—"ফিরেছে বৈ কি, কি একটা বিজনেস্ স্থরু করবে। পৃথিবীটা বড্ড ছোট্ট, না ঊর্মি?"

—"কিন্তু তোমার অত মাথাব্যথা কিসের? আমার সঙ্গে তার এখন কিসের সম্পর্ক?"

জয়দেব ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার আর সাড়া নেই। দুটি হাতের ওপর মাথা রেখে ঊর্মিলা আকাশ-পাতাল ভাবে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের পানে তাকিয়ে ভয় পায়, জয়দেবকে হারাবার ভয়। এবারও কিন্তু ভয়টা নিছক অকারণ, আরো কতবার এমনই অকারণ ভয় পেয়েছে।

না, ছায়া দেখে আর ভয় পাওয়া উচিত নয়—

কত মেয়ের কথা মনে পড়ে, জয়দেবের জানাশোনা মেয়ের দল। রীতিমত এক পাল মেয়ে, তাদের হাত থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়েছে সে, এ কি তার কম কৃতিত্ব। কিন্তু সম্পত্তি আহরণ করার চাইতে রক্ষা করাটাই বড় কঠিন দায়িত্ব। পেয়ে হারানোর জ্বালা বড় জ্বালা, তাই সহজেই তার মনের শান্তি টুকরো হয়ে ভাঙে,—কোথায় কার হাসি, কার দুটো লঘু রসিকতা, কারো বা দু'লাইন চিঠি,—সব মেঘেই যেন আগুনের রঙ।

কতবার ঊর্মিলা মনে করেছে শান্ত হবে, সন্দেহের হাত থেকে মুক্তি নেবে, সব ঝোপেই বাঘ দেখার আশংকা করবে না, তবু হার মানতে হয়। এই সব ছোটখাটো ঘটনাতেই ত' জয়দেবের মন ভাঙতে পারে, আজ কি কেলেঙ্কারীটাই না হ'ল।

ঊর্মিলাও অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সন্ধ্যায় জয়দেব বাড়ি ফিরল একগুচ্ছ রজনীগন্ধা হাতে করে। ঊর্মিলা সানন্দে ফুলগুলি সাজাতে বসে। এমন সময় পিছন থেকে এসে হাত বাড়িয়ে জয়দেব একটি ছোট্ট ভেলভেট কেস এগিয়ে দেয়।

বাক্সটি খুলে ঊর্মিলা অভিভূত হয়ে পড়ল—বল্‌ল, "হঠাৎ যে, এ সব কি কাণ্ড ?"

—"মনে নেই আজ কি দিন বলো ত' ? এগারোই মাঘ, এই দিনেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, মাঘোৎসবের দিন।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি অরুন্ধতীর সঙ্গে এসেছিলে, বাড়ি ফিরেছিলে কিন্তু আমার সংগেই—"

—"হ্যাঁ, সেদিন তোমাকে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল কিন্তু !"

—"আর এখন ?"

জয়দেব গম্ভীর গলায় বলে—"কালের হাতে ত' কারো নিষ্কৃতি নেই, বয়সের সঙ্গে আমাদের সবই বদ্‌লাই। শুধু রূপ আর রঙ নয়, মনও বদ্‌লায়। কিন্তু তোমার সঙ্গে সেদিন কে ছিল মনে আছে, না ভুলে গেছ ?"

—"কেন মনে থাক্‌বে না, মতিদা—মতি সেন।"

—"তা হলে মনে আছে দেখছি !"

—"খুব কি বিচিত্র ঠেক্‌ছে ? তবে মতিদা আর অরুন্ধতী এক বস্তু নয়। অরুন্ধতী তোমার এ ভাবে চলে যাওয়ায় একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল।"

—"সে আর এমন বিচিত্র কি, মেয়েরা চিরদিনই আমাকে নিয়ে ক্ষেপে আছে।"—বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে জয়দেব।

ঊর্মিলা আবেগভরে বলে ওঠে—"সে আর আমি জানি না !"

অনেক দিন পরে এই প্রথম উভয়ের মধ্যে অরুন্ধতীর কথা উঠল। একদা এই অরুন্ধতীর ওপর ঊর্মিলার ঈর্ষার আর অন্ত ছিল না, কিন্তু সে সব অনেক দিন ধুয়ে-মুছে গেছে, কিন্তু তার পরদিনই হঠাৎ তার সঙ্গে ঊর্মিলার দেখা হয়ে গেল। সে এক বিচিত্র সংঘটন।

গারষ্টিন প্লেসে রেডিয়ো অফিসের কর্তৃপক্ষের আহ্বানে গিয়েছিল ঊর্মিলা। কথাবার্তায় অনেক দেরি হয়ে গেল। ফেরার পথে ঊর্মিলা ভাবল, অফিস-পাড়াতেই যখন এসেছে তখন হেস্‌টিংস ষ্ট্রীটে জয়দেবের অফিসে ওঠা যাক্। প্রায় একটা বাজে, একসঙ্গে কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু অফিসে যেতেই জয়দেবের ক্লার্ক হালদার বাবু বল্‌লেন—জয়দেব একটু আগেই বেরিয়েছে।

বিরাট বাড়ি, প্রায় পাঁচশো অফিস আছে এই একটি বাড়িতেই, প্রতি ঘরেই একটি করে অফিস, সলিসিটর জয়দেব চৌধুরীর অফিসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উর্মিলা কিছুক্ষণ ভাবলো কি করা যায়।

জয়দেব প্রতিদিনই গভর্ণমেণ্ট হাউসের কাছে একটা মাঝারি ধরণের হোটেলে লাঞ্চে যায়, সেখানে সচরাচর বেশী ভিড় থাকে না, তাই জয়দেব এই হোটেলটি পছন্দ করে। উর্মিলা সেখানে চল্‌লো, জয়দেব নিশ্চয়ই সেখানে গেছে। মানুষ অদ্ভুত জীব—একই স্থান, কাল ও পত্র তাদের প্রিয়।

জয়দেব এই হোটেলেই এসেছে। কোণের দিকে টেবলে সেই ব্যক্তিটিই ত' বসে আছে, সামনে একটি মেয়ে, তার মুখ কিন্তু এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। বেশ দেখা যাচ্ছে জয়দেব আনন্দে আছে, কারণ হাসির বেগে তার মাথাটা চেয়ারের পিছন দিকে গড়িয়ে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তেই জয়দেবের দৃষ্টি পড়ল উর্মিলার দিকে, আর উর্মিলা দেখতে পেল জয়দেবের সামনের মেয়েটিকে। মেয়েটি আর কেউ নয়, সেই অরুন্ধতী! উর্মিলার মনে হল যেন অতীতের এক দুঃস্বপ্ন তার গলা টিপে ধরেছে, পায়ের তলার মাটি যেন আর নেই।

অরুন্ধতী টেবল ম্যানার্স ভুলে গিয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—"এসো উর্মি,—আজ কি কপাল, একসঙ্গে জয়দেব আর উর্মিলা, দু'জনের সঙ্গেই দেখা। এক ঢিলে দুই পাখি।"

উর্মিলা অনেক কষ্টে মুখে হাসি টেনে এনে বল্‌ল—"অবাক কাণ্ড, ভেবেছিলাম ওঁর ঘাড় ভেঙে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেব, কিন্তু—"

—"কিন্তু আমাকে দেখেই চম্‌কে উঠেছ? কেমন? তাই নয়?"

জয়দেব চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে উর্মিলার বস্‌বার ব্যবস্থা করে দিল। বস্‌তে বস্‌তে উর্মিলা বল্‌ল—"দিল্লী আর কল্‌কাতা যদিও আজকাল উড়ো জাহাজের কল্যাণে দূর নয়, তবু কে জান্‌ত তুমি এখন কল্‌কাতায় এবং উপস্থিত এই হোটেলে?

—"কাল সন্ধ্যাতেই এসেছি, মামলায় জড়িয়ে পড়েছি ভাই, তাই ভাবলুম জয়দেব যখন রয়েছে, ভালো মন্দ যা হয় পরামর্শ ওর কাছেই মিল্‌বে।"

—"তোমার আবার মামলা কিসের? সুজিৎবাবু কোথায়?" বিস্মিত উর্মিলা প্রশ্ন করে।

—"সুজিৎ বাবুর সংগে অরুন্ধতীর বিচ্ছেদ ঘটেছে, একেবারে যাকে বলে জুডিসিয়াল সেপারেশন।" নীরস গলায় জয়দেব এতক্ষণে অরুন্ধতীর হয়ে জবাব দেয়।

ঊর্মিলা কি যে কথা বল্‌বে ভেবে পায় না, তারপর অতি কষ্টে বলে ঃ "তাই নাকি ? আহা—"

—"অতশত তোকে ভাবতে হবে না,—যা হবার তা হয়েছে"—এই বলে জয়দেবের দিকে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে তাকাল। কেমন যেন একটা অন্তরঙ্গ ভাব। তারপর যেন ঊর্মিলাকেই সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলে, "যা হ'ল তার মধ্যে তেমন 'টক্ ঝাল' নেই, বেশ সহমানেই ঘটল—"

জয়দেব সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর গলায় বলে—"না, তা ঠিক বলা যায় না এ সব ব্যাপারে একটু মন-কষাকষি থাকবে বৈ কি—"

ঊর্মিলা বাড়ি ফিরল। মনের ভিতর আবার ঝড় বইছে। যেটুকু শান্তি এসেছিল আজ দুপুরের এই ব্যাপারে তা ভেঙে-চুরে ছারখার হয়ে গেল। সমস্ত বিকেলটা দুপুরের এই ঘটনার কথা মনে পড়েছে। এই কথাগুলি একই গ্রামোফোন রেকর্ড বারবার বাজানোর মত, কেবল মনে পড়েছে। রাতে খাওয়ার সময় ঊর্মিলা প্রায় মরিয়া হয়েই জয়দেবকে বলে—"অরুন্ধতীকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছিল না ?"

একবার ওর মুখের পানে তাকিয়ে জয়দেব জবাব দেও, "চমৎকার ! কিন্তু ঐ পর্যন্তই, ওর বেশী আর যেও না—তোমার আবার যে রকম উদ্ভট কল্পনাশক্তি"— "হঠাৎ একথা তোমার মনে হ'ল যে, আমি কি কিছু বলেছি ?"

—"কিছু না, তবে তোমার যেমন কাণ্ড ! সব কিছুতেই ত' তোমার ভয়,— এমন একটা অহেতুক ঈর্ষায় তোমার মন ছেয়ে আছে যে, তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ নেই।"

ঊর্মিলা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, বলে—"তুমিও কি মহাদেব নাকি ? আমি কারো সঙ্গে হেসে কথা কইলে তোমার 'জেলাসি' হয় না ?"

একটু ভেবে বলে জয়দেব—"হয়-কি না-হয় কে জানে ? মনে ত' পড়ে না। ও-সব প্যানপ্যানানি আমার সয় না।"

—"কি জানি, কিছু না হওয়াই ভালো, ওর চেয়ে দাঁতকনকনানির যন্ত্রণা ঢের ভালো।"

জয়দেবের খাওয়া শেষ হয়েছিল। সে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—"জানো, এ সব কাণ্ড মানুষকে পাগল করে দেয়!"

"উর্মিলা সরলভাবে বলে—আমি ত' সইতে পারি না, যতবার ভাবি, কিছু আর ভাবব না, তবু আমার মনটাকে যেন পেয়ে বসে—"

জয়দেব বলে—"ওটা একটা ম্যানিয়া। ডাঃ চন্দ্রশেখরের কাছে যাও, তিনি তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন—"

—"ডাঃ চন্দ্রশেখর কেন, আমিই কি বুঝি না কিছু, জানি সবটাই নিছক বোকামি। জানো, মাঝে মাঝে ভাবি, এমন যদি স্বামী হ'ত কেউ তার দিকে তাকাতে পারত না তা হলে হয়ত ভালো হ'ত।"

জয়দেব করুণার ভঙ্গীতে' হাস্‌ল, বল্‌ল—"অন্ততঃ একটা কথা আমাকে দিন-রাত মনে করিয়ে দাও তুমি যে আমি একজন সুপুরুষ। বুড়ো বয়সে অন্ততঃ এই ভেবে আনন্দ পাব।"

এর পর আর কিছু দিন এ নিয়ে কোনো কথাই উঠল না, তবে অরুন্ধতী দিন-রাতই উর্মিলার মনের আকাশ ছেয়ে রইল। জয়দেবও অরুন্ধতী-প্রসঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে চল্‌ত আর উর্মিলাও কিছু কথা তুল্‌তো না।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে কথাটা তুল্‌লো উর্মিলা, হঠাৎ বলে উঠল—"অরুন্ধতীদের খবর কি? তার মামলার কি হ'ল?"

—"খবর ভালোই, কাল দুপুরে লাঞ্চে এসেছিল। কেন?"

—"না, এমনই জিগগেস করছিলুম, তুমি ত' কিছুই বলো৷ন!"

—"মনেই ছিল না, একেবারে ভুলে গিছলাম।"

তারপরের সপ্তাহে রাতে খাওয়ার সময় ফিরল না জয়দেব, টেলিফোন জানালো বাইরে খেয়ে নেবে, কাজ কাছে, ফিরতে দেরি হবে। আগেও অনেকবার এমন ঘটেছে, উর্মিলা তাই বিষয়টিতে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু মাঝে-মাঝে প্রায়ই এমন ঘটতে লাগল। একদিন বাড়ি ফিরল জয়দেব তখন বারোটা বেজে গেছে।

বসে বসে মশার কামড়ে ক্লান্ত হয়ে উর্মিলা বিছানায় প্রবেশ করলেও ঘুমাতে যায়নি, চুপ করে পড়েছিল। জয়দেব ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জাল্‌তেই উর্মিলা আচমকা জেগে ওঠার ভান করে ধড়মড় করে উঠে বসল।

মশারির দরজা খুলে জয়দেব বললে—"আলোটা চোখ পড়তে বুঝি ঘুম ভেঙে গেল, আহা—!"

হাই তুলে উর্মিলা বলে—"অনেক রাত হয়েছে না, ক'টা বাজল ?"

জয়দেব শুধু মাথা নেড়ে জানাল রাত হয়েছে, কিন্তু কোনো কথা বলল না। আর উর্মিলা প্রায় সারা রাত ছটফট করে কাটাল, কেবল মনে হ'ল সেই অরুন্ধতীর জালে বোধহয় জয়দেব ক্রমশঃই জড়িয়ে পড়ছে।

জয়দেবের ব্যাপারটি ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, দিন-দিন যেন ব্যস্ততা বেড়েই চলেছে, যদিচ অমনোযোগের তেমন লক্ষণ দেখা যায় না, তবু যেন মনে হয় তার মন পড়ে আছে অন্যত্র। বুধবার, বৃহস্পতিবার, পর-পর হু'দিনই ফিরতে রাত হ'ল জয়দেবের, আর শুক্রবার যখন সন্ধ্যার পর আবার টেলিফোন বেজে উঠল, তখন যন্ত্রণায় আকুল হয়ে উঠেছে উর্মিলা। কি যে সংবাদ পাবে তা সে আগেই জানে—কেমন একটা হতাশা ভরা বেদনা যেন তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে।

—"উর্মি, একটা হুঃসংবাদ দিচ্ছি।"

—"বুঝেছি, ফিরতে দেরি হবে ত' ?"

—"হ্যাঁ, জানি তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু বিশেষ কাজে আটকে পড়েছি।"

—"জানি !"

লাইন কেটে যাবার অনেক পরেও টেলিফোনের রিসিভারটা জোরে হাতে চেপে রেখেছে উর্মিলা, ফলে হাতটা অবশ হয়ে গেছে। উর্মিলা আজ একটা কাণ্ড করবে।

ঠিক আটটার পর সাড়িটা বদ্‌লিয়ে বেরিয়ে পড়ল উর্মিলা, পথে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে বল্‌ল, "পার্ক সার্কাস।"

পার্ক সার্কাসের ঝাউতলা রোডেই একটা ফ্লাট-বাড়িতে অরুন্ধতীরা থাকে, সেইখানে আজ উর্মিলার নৈশ অভিযান।

ট্যাক্সি যখন আধুনিক ঢঙে তৈরী সিমেণ্ট আর বালি জমানো ফ্লাট-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, তখন আর নাম্‌তে পারে না উর্মিলা, সারা শরীর এমন ভারী হয়ে উঠেছে যে তাকে টেনে তোলার শক্তি তার নেই। অনেক পরে ধীরে ধীরে ট্যাক্সি থেকে নেমে ড্রাইভারকে টাকা দিয়ে পেভমেণ্টের ওপর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই ইট-পাথর আর কাচ দিয়ে ঘেরা বাড়িটায় কি রহস্য ভরা আছে যেন তার সন্ধানে উর্মিলার আকুল চোখ সেটা

খুঁজে পেতে চায়! এই শেষ—যা তার স্বপ্ন, যা তার আশা আর আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তিল-তিল করে তৈরী হয়েছে আজ তার শেষ দেখবে সে—

তিন তলার ফ্লাটে অরুন্ধতীরা থাকে, সিঁড়িও অনেক। সিঁড়িতে দড়ির ম্যাটিং করা, কিন্তু ফ্লাট-বাড়ির ভাগের মা গঙ্গা পায় না, নোঙরা, কাগজের টুক্‌রো, সিগারেটের খালি বাক্স চার পাশে ছড়ানো রয়েছে,—গা ঘিন্‌-ঘিন্‌ করে। অথচ ওপাশে কাদের ফ্লাটে একটি মেয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত অনুশীলন করছে—

"শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বল্‌বে ?"

গাইছে ভালো। তেতলায় উঠে সিঁড়ির সামনেই অরুন্ধতীর ফ্লাট। কলিং বেলে চাপ দিতেই সে সামনে এসে দাঁড়াল সে অরুন্ধতী স্বয়ং, ঊর্মিলাকে দেখে অবাক, বললে, "কি রে ঊর্মি, তুই এত রাত্তিরে ? এই বৃষ্টিতে ? ভিজে গেছিস যে ? আয় ভেতরে আয়।"

ঊর্মিলা বলে—"এদিকে এসেছিলাম, ভাবলাম তোমাদের একবার দেখে যাই—"

—"বেশ করেছিস্‌, আয় ভেতরে আয়।"

—"ভাললুম রিং করবো তা আর হয়ে উঠল না—"

—"ন্যাকামি করিসনি, রিং-ফিং আবার কি ? সত্যি তোকে আশাই করিনি, ভালোই হ'ল, আমাদের এক বন্ধু রয়েছেন, আয় আলাপ করিয়ে দিই।"

এখান থেকে অরুন্ধতীর বন্ধুর ঘাড়টা দেখা যাচ্ছে দরজার দিকে পিছন করে বসে আছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে জয়দেব।

প্রায় কাঁপতে কাঁপতে ঊর্মিলা ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলো, চমৎকার সাজান ঘর, পাথরের বুদ্ধমূর্তি থেকে মির্জাপুরী কারপেট—কোনো কিছুর অভাব নেই। লোক্‌টি এতক্ষণে এদিকে মুখ ফেরাল।

অরুন্ধতী বলে উঠল—"ছবি—ছবি ধর, নিশ্চয়ই নাম শুনেছিস, সম্প্রতি 'কালো মেঘ' ডিরেক্ট করেছেন, খুব সাক্‌সেস হয়েছে, এবার বম্বে যাচ্ছেন, 'আঁখ্‌কা কিড়কিড়ি' ছবি তোলা হবে।"

—"সে আবার কি ?"

—"হরি বল—রাষ্ট্রভাষায় জ্ঞান তোর কত কম, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', হিন্দীতে ঐ বলে।"

পাজামা এবং পাঞ্জাবী-সজ্জিত সিনেমার ছবি ধর বেশ কায়দা করে নমস্কার জানালেন ঊর্মিলাকে।

ঊর্মিলা নেহাৎ পোষাকী ভদ্রতা হিসাবে পাল্টা জবাব দিল, একে তার মন খারাপ, তাছাড়া এই লম্বা জুলপিওলা লোকটিকে তেমন ভালো লাগছিল না।

অরুন্ধতী বলল—"ইনি আমার বন্ধু ঊর্মিলা চৌধুরী, অর্থাৎ আমার সলিসিটর জয়দেব চৌধুরীর মিসেস্।"

লোকটি বলে উঠল—"ও, আই সী। জানেন মিসেস্ চৌধুরী, কেস্টা শেষ হলেই অরুন্ধতী আমার ফিল্‌মের হিরোইন হচ্ছেন।"

ঊর্মিলার বিস্ময়ের আর শেষ নেই, শেষটায় অরুন্ধতীর মত একটা অ দি ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে ফিল্‌মে নাম্‌বে! শুধু বললে—"সত্যি! এটা একটা সারপ্রাইজ!"

বসল ঊর্মিলা, সে অতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এই অরুন্ধতী, সিনেমায় নামতে চলেছে, আর ঊর্মিলা সন্দেহের উৎকট দংশনে এর জন্যই মাথা খারাপ করে বসেছে। সহসা তার মনে একটা স্বস্তি ও সান্ত্বনার ভাব জাগল। সে বলল—"আমি কিন্তু বেশীক্ষণ থাক্‌বো না, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।"

—"বস্। একটু কিছু খা, কফি খাবি ?"

—"নাঃ, কিচ্ছু না, খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, এইবার ফিরি আর একদিন সময় করে আস্‌ব।"

তার মন থেকে সব হিংসা, দ্বেষ ধুয়ে-মুছে গেছে।

অরুন্ধতী বিশেষ আপত্তি করল না, আবার সিঁড়ি পর্যন্ত নেমে এল ঊর্মিলাকে এগিয়ে দিতে।

নীচে নেমে শুধু বল্‌ল, "এসে সত্যি ভালো করেছিস্, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন বুঝলাম না—"

—"তাড়াতাড়ি কোথায় ? ন'টা বেজে গেছে, আর একদিন ত আস্‌ছি।"

—"সেই ভালো।"

পথে নেমে দেখা গেল তখনও ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। শীতের রাত্রি তায় বৃষ্টি, পথ-ঘাট নিঝুম, কাছাকছি ট্যাক্সিও নেই, সেই পার্ক সার্কাস ট্রাম-ডিপোর কাছে ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ড।

ভিজতে ভিজতেই চলেছে উর্মিলা—আজ তার মন অনেক হাল্‌কা, পথ চলা আজ আর তার কাছে কঠিন নয়।

পিছন থেকে তীব্র হেডলাইট জ্বালিয়ে এক প্রকাণ্ড গাড়ি এগিয়ে আস্‌ছে, মুখ ফিরে তাকিয়ে দেখে উর্মিলা—ট্যাক্সি না প্রাইভেট গাড়ি।

গাড়িটা উর্মিলার গা ঘেঁষে সজোরে ব্রেক কষল, ড্রাইভারের এই অভব্যতায় বিরক্ত হয়ে উর্মিলা পেভমেণ্টে ওঠার উদ্যোগ করছে, গাড়ির দরজা খুলে গেল, ভিতর থেকে কে বলে উঠল,—"উর্মি, ভেতরে চলে এস, ভিজ্‌ছ কেন?"

বিস্মিত উর্মিলা কণ্ঠস্বর চিনল,—"কে—মতিদা? তুমি এখানে?"

—"ফলো করিনি নিশ্চয়ই, পিছন থেকে ঠিক ধরেছি।"

গাড়িতে উঠতে উঠতে উর্মিলা বলে—"শুনেছি তুমি কলকাতায় ফিরেছ, কিন্তু দেখা করোনি কেন, বিশেষ তেমন বদলাওনি ত?"

—"কতদিন তোমাকে দেখিনি বলো ত?"

—"বিয়ের পর থেকেই। তার পনের দিন পরেই ত তুমি সেল করেছিলে—"

—"মনে আছে দেখছি, বলো কোথায় নিয়ে যাব?"

—"সোজা বাড়ি, আমাদের বাড়ি ত' জানো, সেই সনাতন শ্যামপুকুর স্ট্রীট!"

উর্মিলার জীবনে জয়দেবের আবির্ভাবের আগে এই মতি সেনের সঙ্গেই তার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গিছল, সবাই জান্‌ত ওদের বিয়ে হতে আর দেরি নেই। তারপর জয়দেবের নাটকীয় আবির্ভাব ও তার পনের দিন পরেই বিবাহ।

আজ এই মুহূর্তে মতি সেনকে হাতের কাছে পেয়ে একটা মধুর অতীতের কথা মনে পড়ল। তখন পুরুষরা উর্মিলাকে নিয়ে একটা ঈর্ষা বোধ করত আর উর্মিলা নিজের রূপ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করত। আজ ওর পাশে বসে কেমন যেন একটা অন্তরঙ্গ আকুলতা এসে উর্মিলার মন আচ্ছন্ন করে দেয়। এই উষ্ণ সান্নিধ্যে আজ যেন পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। নারী জাতির এই ত' চিরন্তন কামনা, পুরুষ তাকে আদর করুক, তার পূজা করুক, তার জন্য জলে-পুড়ে মরুক।

বাড়ি এসে গেল—মতি সেন গাড়ির দরজাটা খুলে হাত ধরে নামাল উর্মিলাকে। বলল,—"আশ্চর্য, এমনভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি, অথচ আজ ক'দিন ধরে তোমার কথাই কেবল মনে মনে ভেবেছি,

তাই বোধ হয় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তুমি কিন্তু এই ক'বছরে একটুও বদ্‌লাওনি, একটু হয়ত মোটা হয়েছ—না ?"

—"যাঃ, ওয়েট ত ঠিকই আছে !"

দোর-গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আবার গাড়িতে এসে বস্‌ল মতি সেন। ঊর্মিলা তখন বলছে, "একদিন ঠিক এসো কিন্তু—"

ওপরে উঠে গেল ঊর্মিলা, তখনও জয়দেব বাড়ি ফেরেনি। রেন-কোটটা চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেলল ঊর্মিলা, তার পর ড্রেসিং টেবলের সামনে ব্রাস নিয়ে মাথা আঁচড়াতে সুরু করল, অনেক দিন এই নিত্যকর্মটিতে অবহেলা হয়েছে, আজ কিন্তু মন অনেক হাল্‌কা।

পিছন থেকে সহসা হাত চেপে ধরল জয়দেব। সে নিঃশব্দে কখন এসেছে। ঊর্মিলা চম্‌কে উঠে বল্‌ল—"তুমি ? কখন এলে ?"

—"বড় আশ্চর্য লাগছে, না ? কোথায় গিয়েছিলে হঠাৎ ?"

ঊর্মিলার্ মুখ দিয়ে সত্য কথা বেরোল না, বল্‌ল—"পিসিমার বাড়ি গিছলাম, অনেকদিন ও-পাড়ায় যাইনি।"—কথাগুলো কিন্তু সহজ সুরে বেরোল না।

চেয়ারে বসে জুতা ছাড়তে ছাড়তে জয়দেব গম্ভীর গলায় বলে—"আজকাল কি পুরানো বন্ধুদের নিয়ে মাসীমা-পিসিমাদের বাড়ি ঘুরে বেড়াও ?"

—"ওঃ, এই কথা, মতিদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা, ট্যাক্সি খুঁজছিলাম, ও পিছন থেকে এসে লিফট্ দিল, কিন্তু তাতে কি ?"

জয়দেব সহসা উঠে এসে আবার ঊর্মিলার হাত চেপে ধরল—"আমাকে তুমি কচি খোকা পেয়েছ, না ? ওসব আমি ঢের জানি।"

—"কি করছ, ছাড়, আমার হাতটা ভেঙে দেবে নাকি ?"

—"তার আগে জবাব দাও, কত দিন এ লীলা-অভিসার চল্‌ছে ?"

—"ছিঃ তুমি কি, আমার কথায় তোমার বিশ্বাস নেই ?"

—"হ্যাঁ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, আমি নিজের চোখে দেখেছি মতি সেন তোমার হাত ধরে আছে—"

—"হাত ধরে আছে ত কি হয়েছে ?"

জয়দেব সহসা ঊর্মিলার খোঁপা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে...."কি হয়েছে তার মানে কি তুমি জানো না ?

—"ছিঃ,তোমার মন এত ছোট হয়ে গেছে?"—কান্নায় ভেঙে পড়ল ঊর্মিলা।

জয়দেব তবু আঘাত দিয়ে বললে, "ন্যাকামি ভরা কান্না রাখো, ঐ তোমাদের শেষ অস্ত্র।"

ঊর্মিলা কাঁদ্‌ছে, অতি করুণ তার কান্না, তারপর সহসা সে উন্মত্তের মত হেসে উঠল—অট্টহাস্য!

চম্‌কে উঠল জয়দেব, "ঊর্মিলা কি পাগল হয়ে গেল নাকি?"

ঊর্মিলা বলল—"ডাঃ চন্দ্রশেখরের কাছে এবার তুমি যাও। অকারণ ঈর্ষা মানুষকে কত নোঙরা, কত ছোট করে দেখলে?"

তৎক্ষণাৎ জয়দেব তার পাশে উঠে গিয়ে কাঁধে হাত রাখল, সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলল..."ঊর্মি, হঠাৎ আমার কেমন যেন মনে হল,—তুমি কিছু মনে কোরো না।"

ঊর্মিলা তখনও কাঁদছে।

রাতে বিছানায় শুয়ে প্রথমটা ঘুম আসে না ঊর্মিলার। আবার সেই দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, আবার সেই চিন্তার স্রোত। কিন্তু পাশে নিদ্রিত জয়দেবের গায়ে হাত দিয়ে সকল জ্বালা যেন ইন্দ্রজালে দূর হয়ে গেল। জয়দেবও শেষকালে সন্দেহ ও ঈর্ষার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারল না, তারও মনে বিষাক্ত বিষ।

কিন্তু আর যাই হোক্, আজকের রাতে অরুন্ধতীর কোনো স্থান নেই,—আর কেউ কোথায় নেই, আছে শুধু ও আর জয়দেব! জয়দেব তাহলে ওকেই ভালোবাসে।

রজনীগন্ধা

খুব বেশী দিনের কথা নয়, এই কল্‌কাতা শহরে শ্রীমতী চৌধুরীর নাম সকলের মুখে মুখে ফিরত। যে সব নাটকে তিনি অভিনয় করতেন তা দেখতে দর্শক ভেঙে পড়ত, বিশেষ করে 'পথহারা' নাটকে তাঁর মালিনী-চরিত্রের অভিনয়ের পর বাংলা দেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে অকুণ্ঠিত প্রশংসায় শ্রীমতীর গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিল। নাট্যকাররা তাঁর চরণ বন্দনা করতে সুরু করলেন, আর ম্যানেজাররা ত' তপস্যা আরম্ভ করলেন, প্রায় 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল'। উন্নাসিক আর নিম্ন-নাসিক সকলেরই তিনি প্রেয়সী। মধুমত্ত ভৃঙ্গের মত বহুজন লুব্ধ চিত্তে ঘোরাফেরা করতেন।

আমি সেই অল্প বয়সেও অন্ততঃ বার সাতেক 'পথহারা'র অভিনয় দেখেছি, শুধু শ্রীমতীর কথা শোনার জন্যই যেতাম, সত্যই যেন বুকের মাঝে রক্তধারা নাচত। যেমন পার্ট তেমনিই তার অভিব্যক্তি। শ্রীমতীর প্রতিভা সম্পর্কে কারো মনে সংশয় ছিল না। যেমন 'কেমেডি' তেমনই 'ট্রাজেডি'। কতদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে হোষ্টেলে ফিরে এসে রাতের খাওয়াটা নষ্ট করেছি। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, রমণীটি যে অতিরমণীয় তা নয়, তেমন কিছু ভুবনমোহিনী রূপ নয় তবু তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য সমালোচক আর ভক্তদের মুগ্ধ করে রেখেছিল!

আমি গোবেচারা মানুষ, শ্রীমতী চৌধুরীর এই অসামান্য কৃতিত্ব হতভম্ব হয়ে লক্ষ্য করতাম, মনে মনে ধারণা ছিল এ এক ইন্দ্রজাল, নইলে সীতায় ঠিক সীতার মত, ষোড়শীতে ষোড়শী, পরপারেতে সরযু, প্রফুল্ল নাটকে প্রফুল্ল আবার চন্দ্রশেখরে শৈবালিনী। কি অদ্ভুত শক্তি, কি অনন্যসাধারণ প্রতিভা! যৌবনের পরিপূর্ণ আবেগে আমি একান্তভাবে এই নটীকে পূজা করেছি, তার সমস্ত ভঙ্গী, বাচন-ভঙ্গিমা, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য সবই আমার কাছে বিস্ময়। একটু দর্শনের আশায় ষ্টেজের দরজায় অনেকদিন উঁকিঝুঁকি দিয়েছি, চেষ্টা করেছি তাঁর পরিচিত কাউকে ধরে ওঁর মুখেই জীবন-কথা শোনার জন্য।

সম্ভবপর সব চেষ্টাই করেছি কিন্তু সফল হইনি, তাতে অবশ্য বিস্মিত হইনি, কারণ আমার বয়স ছিল অল্প, আর পরিচয় ছিল শুধু আমারই সমবয়সী ছাত্রদের সঙ্গে, কাজেই কোনো যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

ভাবতাম, না জানি কেমন দেখতে ? কিন্তু কেউই তা জান্‌তো না, শুধু জান্‌তাম তিনি নাকি মমতাময়ী, হৃদয় অতি কোমল।

তারপর পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর সরকারী চাকরী-সূত্রে দিল্লী চলে গেলাম, আমার মনের বাসনা অপূর্ণ রয়ে গেল। সুরেন্দ্র-বন্দিতা শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা আর করা গেল না।

দিল্লী বাঙালী সমিতির উদ্যোগে মাঝে মাঝে যে সব নাটক অভিনীত হত, আমি তাতে এক-আধটা পার্ট নিতাম। অত্যন্ত উৎসাহী সভ্য হয়ে গেলাম দিল্লীর নাট্য-সমিতির। নাট্য-জগতের সঙ্গে এইটুকুই আমার সংযোগ রইল।

এইভাবে নাট্যরসপরশহারা হয়ে যখন দিল্লীর শুকনো পরিবেশে দিন কাটছে তখন হঠাৎ শোনা গেল একটি নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে শ্রীমতীও দিল্লী আসছেন, কয়েকদিন এখানে থেকে অভিনয় করবেন।

আমার কাছে এই সংবাদ কাঙালের লাখ টাকা পাওয়ার মত, আমি তখনই উদ্যোক্তাদের সঙ্গে দেখা করে সব সংবাদ সংগ্রহ করলাম। আবার দেখলাম—পোষ্টারে লাল অক্ষরে শ্রীমতীর নাম। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে সেই নামের দিকে তাকিয়ে থাকি। দুদিন গিয়ে ষ্টেজও দেখে এলাম।

প্রথম দিনের অভিনয়েই দিল্লী শহর মাৎ—সাতদিনের টিকিট অগ্রিম বুক হয়ে গেল। চারিদিকে সকলের কেবল ঐ একমাত্র আলোচনা।

দ্বিতীয় রাত্রে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের অন্যতম হয়ে নিঃশ্বাস রোধ করে আমিও অভিনয় দেখলাম, অভিনয়ান্তে আরো অনেকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে শ্রীমতীর নাম নিয়ে জয়ধ্বনি করে গলা ফাটালাম। পর্দার সামনে এসে তিনি যখন দাঁড়ালেন তখন সবিস্ময়ে দেখি আমার চোখ জলে ভরে গেছে। সে যে কি আনন্দ তা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

রাতে বিছানায় শুয়ে বিনিদ্র নয়নে ভাবতে লাগলাম,—সারা দেশের কাছে এইভাবে অভ্যর্থনা পাচ্ছেন শ্রীমতী চৌধুরী। না জানি তাঁর মনের অবস্থাটা কেমন! কি মধুর তাঁর জীবন। সব কিছুই ত' ওঁর করায়ত্ত, যৌবন,

প্রতিভা, বুদ্ধি, শ্রী, তারপর আছে অর্থ, আর এই সিদ্ধি। এর চেয়ে মানুষের আর কি কাম্য থাকতে পারে? এ আনন্দ শুধু আবিষ্কারক আর বৈজ্ঞানিকেরই আছে। আমি নাট্যরসিক প্রাণী, তাই শ্রীমতী চৌধুরীর এই সাফল্য আমার কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দিল।

অবশেষে শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা হওয়ার একটা সূত্র মিলল। গোড়ার দিকে জয়দেব মজুমদারের 'মধুযামিনী' নাটকে শ্রীমতী অভিনয় করেছিলেন। জয়দেব মজুমদার দিল্লীতেই এখন থাকেন, আমারও পরিচিত। আমারই আগ্রহে জয়দেব বাবু শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা করার বন্দোবস্ত করেছেন, শ্রীমতীও যেতে লিখেছেন। এই কথা শুনেই আমি জয়দেববাবুকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলাম, আমাকেও নিয়ে যেতে হবে।

এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, কি রকম দেখতে? উনি বললেন—যত দূর মনে আছে, সাদাসিধে ও সরল বলেই ত' জানি।

একদিন রাতে জয়দেববাবুর সঙ্গে তালকাটোরা অঞ্চলের সেই রঙ্গমঞ্চে চল্‌লুম। জয়দেববাবু ভেতরে খবর পাঠালেন, আমি প্রত্যাশাভরা মনে কম্পিত হৃদয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সবে যবনিকা পড়েছে, দর্শকদের হাততালি আর চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক এসে আমাদের ভেতরে যেতে বললেন। আমি বিস্মিত হলাম, আরো অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে ভেবেছিলাম। ষ্টেজের ভিতর দিয়ে চল্‌লাম শ্রীমতীর ঘরে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, স্ত্রীলোকটি দরজা খুলে আমাদের ভেতরে যেতে বলল।

সাজঘরটি ছোট্ট অথচ মনোরম, আরশির সামনে শ্রীমতী বসে মুখের পেণ্ট তুলছেন, ড্রেসিং টেবিলের ওপর কয়েকটি টুথপেষ্ট টিউবের মত নানা রঙের টিউব নানা আকারের ব্রাশ, ক্রীমের কৌটা ইত্যাদি পড়ে আছে। পরনে একখানি রঙীন শাড়ি। বেশ বোঝা গেল শ্রীমতী কাঁদছেন।

দরজার দিকে মুখ না ফিরিয়ে নাক-মুখ মুছে শ্রীমতী বললেন—কে?

আমার সঙ্গীটি বললেন—আমি জয়দেব, শ্রীমতী!

তৎক্ষণাৎ শ্রীমতী মুখ ফিরিয়ে বস্‌লেন,—এই প্রথম যে মুখ এতদিন ধ্যান করে এসেছি তার মুখোমুখি হলাম। এই প্রথম লক্ষ্য করলাম ষ্টেজে-দেখা তাঁর

আকৃতির সঙ্গে এই চেহারার প্রভেদ কোথায়, চোখ দু'টি উজ্জ্বল হলেও স্টেজের মত নয়,—স্বপ্ন-ভরা চোখ, চোখের জলে কিঞ্চিৎ ফুলে উঠেছে।

জয়দেববাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে শ্রীমতী স্বাদহীন কণ্ঠে বললেন—কিছু মনে করবেন না জয়দেব বাবু, আজ একটা দুঃসংবাদ এসেছে, মনটা ভালো নেই, কতদিন পরে দেখা। এতদিনে আপনি কিন্তু একটু বুড়ো হয়ে আসছেন, চুলও পেকেছে দেখছি।

জয়দেববাবু বললেন ঃ শ্রীমতী, চল্লিশের পর বয়সটাকে আর ধরে রাখা যায় না, চুল পাকে, দাঁত পড়ে, চোখের চাল্‌সে সব কিছু জড়িয়ে এক বিরাট ষড়যন্ত্র। বয়স বাড়ছে—

শ্রীমতী হাসলেন—বললেন, বসুন, একটু চা খান। শৈল, শীগগির দু' কাপ চা পাঠিয়ে দে, আর কাউকে ঢুকতে দিসনি, আজ আর কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবো না। এই বলে শ্রীমতী টেবিলের ওপর থেকে কাঁচের গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন, বুঝলাম মদ।

তারপর সেই গ্লাসটা হাতে নিয়েই ক্যানভাসের ডেক চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিলেন।

জয়দেববাবু বললেন ঃ আবার দেখছি মদ ধরেছ,—বেশ ত' ছেড়ে দিয়েছিলে।

শ্রীমতী এতক্ষণে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলেন। বললেন, আমাদের আবার ধরা আর ছাড়া। ছেড়েছিলুম যে একদিন সে আপনার কথায় মনে হল।

শ্রীমতী আবার রুমাল টেনে নাক-মুখ মুছলেন।

জয়দেববাবু এইবার এক রকম জোর করেই বললেন—এই ছেলেটি—

কিন্তু শৈল ঝি আবার দরজা খুলে এসে দাঁড়ায়। শ্রীমতী শৈলর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আজ আর কারো সঙ্গে দেখা করব না শৈল! একটি প্রাণীও না! জয়দেববাবু, নতুন কিছু লিখছেন? আপনার বইটা খুব সাকসেস হয়েছিল আমার! আচ্ছা, আমারও চেহারা খুব বিশ্রী হয়েছে না? একটু মোটাও হয়েছি!

এই বলে শ্রীমতী আয়নায় মুখটা একবার ভালো করে দেখে নেন। তারপর আবার স্বগতোক্তি,—আর পারি না, মাঝে মাঝে ভাবি এখন আমার মরাই ভালো।

জয়দেববাবু হেসে বললেনঃ শ্রীমতী, পৃথিবী এখন তোমার পদানত! এত খ্যাতি, এই প্রতিষ্ঠা, এর মধ্যেই জীবনে অরুচি।

চমৎকার হাতদুটি শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে শ্রীমতী বলে উঠলেন—ছাই খ্যাতি! জয়দেববাবু, এই খ্যাতিই আমার সর্বনাশ করেছে, এই আমার কাল, আমার জীবনটা নষ্ট করেছে এই প্রতিষ্ঠা। শনিবার, রবিবার দুটো করে শো, সপ্তাহে তিনটে ম্যাটিনী, কোনো কোনো দিন দুটো শো'তে চারটে বই, তার মানে দু'বার চেঞ্জ। গলার জন্য কি করি বলুন ত'? কোনো ভালো ইয়ার নোজ, থ্রোট-এক্সপার্ট জানা আছে? শো দেখেছেন?

আমি এতক্ষণে বললাম—আমি ক'দিনই দেখছি!

শ্রীমতীর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল।

জয়দেববাবু বললেন—কি অভিনয়! অপূর্ব উন্নতি হয়েছে তোমার!

শ্রীমতী আবার ভেঙে পড়লেন—না, না, এ অতি বিশ্রী কাণ্ড! আমার নিজেরই লজ্জা হয়। আমার আর কিছু দেবার নাই, ফুরিয়ে গেছি, যেটুকু শিখেছিলাম হরিশবাবুর কাছে তাও যেন ভুলতে বসেছি। যদি একটু বিশ্রাম না পাই ত' মারা যাব। আমার গলাটা শুনেছেন? একেবারে গেছে! এই বলে শ্রীমতী গলায় একটা ঘড়-ঘড় করে আওয়াজ তুললেন।

জয়দেববাবু বললেনঃ ও তোমার গলা নয়, তোমার গলা ষ্টেজে চমৎকার স্পষ্ট শোনায়, তা ছাড়া শ্রীমতী, অডিয়েন্স তোমাকে কি ভাবে নিয়েছে দেখছ!

করুণ গলায় শ্রীমতী বলে ওঠেন, সেইখানেই ত' মুশকিল! ওই জন্যই ত' এতটুকু ছুটি নেই আমার। কাউকে নিরাশ করতে চাই না, কিন্তু সত্যি এ সব আর আমার সয় না, এবার না হয় ষ্টেজ ছেড়ে দেব। ওষুধ আর ওষুধ। ওষুধ খেয়েই বেঁচে আছি, কি রে শৈল, তাই না?

শৈল থোট-স্প্রেটা এনে পাশের টিপয়ে রাখল। স্প্রেটা তুলে নিয়ে শ্রীমতী আবার বললেন, কই রে শৈল, এঁদের চা? তারপর কিছুক্ষণ স্প্রে করে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে শুয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার দিকে লক্ষ্য পড়তে বলে উঠলেন—জয়দেববাবু, ও কেমন অবাক হয়ে চেয়ে আছে দেখুন আমার দিকে, ছেলেটি কে?

জয়দেববাবু সুরু করলেন—ও হল……

আবার দরজায় ধাক্কা।

— শৈল, কাউকে এখন আসতে দিসনি, আমার শরীর বড় খারাপ।

শৈল দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

শ্রীমতী আবার বললেন—সত্যি জয়দেববাবু, আপনাব সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবিনি, ফিনিক্স থিয়েটারে যখন আপনার বইটা হ'ত মনে আছে? কি দিনই গেছে, ওখানেই ত' প্রথম অমলেশকে দেখি···।

কথাগুলি বলার সঙ্গেই শ্রীমতীর চোখ জলে ভরে উঠল, আবার রুমালে চোখ মোছেন শ্রীমতী। বলেন—তারপর থেকে কি ভাবে যে দিন কাটছে—

শৈল দরজায় কার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছে। তারপর ফিরে এসে বলে, দিদিমণি, নইসড়ক থেকে 'দীপাবলী' কাগজের লোক এসেছে, তুমি নাকি আস্‌তে বলেছিলে?

—বেশ আসুক, তবে দু'-চার মিনিট।

দীর্ঘদেহ এক হিন্দুস্থানী তরুণ ঘরে এসে ঢুক্‌লেন। বুঝলাম ইনিই 'দীপাবলী' পত্রিকার তরফ থেকে এসেছেন!

শ্রীমতী তাঁর দিকে তাকিয়ে চমৎকার হিন্দীতে প্রশ্ন করলেন, আপনার নাম?

রিপোর্টার বললেন—ঈশ্বরদাস ত্রিপাঠী।

—শৈল চেয়ার দাও! বসুন, আমার শরীরটা ভালো নয়,—ও, মাথাটা কি বিশ্রী ধরে। শৈল, চা কই? কি নাম বললেন?

—ত্রিপাঠী।

—হ্যাঁ, ত্রিপাঠিজী, কি জানতে চান বলুন? যা বলার তা ত' আগেও বলেছি নতুন কথা কি আর বলার আছে?

—আমি আপনাকে শুধু দুটি প্রশ্ন করব। আমরা ষ্টেজ আর স্ক্রীণের সকলকেই এই প্রশ্ন করেছি।

—মাত্র দুটি প্রশ্ন? বেশ, শুরু করুন! নিন চা খান! আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—খাও বাবা চা খাও, লজ্জা কি! জয়দেববাবু ছেলেটির সঙ্গে পরিচয় হল না।

জয়দেববাবু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন—সুযোগ হচ্ছে কই! আমিও সলজ্জ ভঙ্গীতে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলাম।

শ্রীমতী আবার বললে, জয়দেববাবু, ছেলেটি বেশ! কি নাম বললে তোমার? আচ্ছা থাক, ইনটারভিউটা হয়ে যাক।

রিপোর্টার ত্রিপাঠীজী এইবার কাগজ-পেনসিল বার করে বললেন—আমার প্রথম প্রশ্ন, ষ্টেজে আপনি কি ভাবে এলেন ?

শ্রীমতী বলে উঠলেন, হা ভগবান, সেই পুরাতন প্রশ্ন ?

'দীপাবলী' পত্রিকার ত্রিপাঠীজীও সলজ্জ ভঙ্গীতে হাসলেন।

শ্রীমতী বলতে শুরু করলেন চাপা-গলায়, যখন আমার চোদ্দ বছর বয়স তখন একজন অভিনেতার প্রেমে আমি মশগুল হয়ে যাই, তার নাম বলতেও আপত্তি নেই, যদুপতি কর, তখনকার কালের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। সেকালের সব নাটকের নাম 'সাবাস বাঙালী', 'দুঃখের পাঁচালী', 'মেবার পাহাড়', 'মোগলের দুর্মতি',। আমি ত' পাগল, তাই কি করে অভিনয় করতে হয় সেইটাই হল আমার সর্বপ্রধান চেষ্টা, লেখাপড়া শেখার ফাঁকে কিঞ্চিৎ অভিনয়-চর্চাও করতাম আমরা। আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল 'মেবার পাহাড়ে' শেষ দৃশ্যে পদ্মিনীকে যেমন জড়িয়ে ধরেন আমাকেও তেমনই বুকে জড়িয়ে ধরবেন।

রিপোর্টার পরমানন্দে লিখতে লিখতে প্রশ্ন করলেন—সে অভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল ?

না, নিজেকে নিয়ে এমনই মেতে উঠলাম, তাঁর কথা ভুলে গেলাম। পনের বছর পরে মধ্যবয়সীর এক পার্টের জন্য একজন বৃদ্ধ অভিনেতাকে ম্যানেজার নিয়ে এলেন, বললেন—এককালে ইনি ভালো অভিনয় করতেন! আমার ভালো লাগল না। মুখটা পরিচিত মনে হলেও ভালো লাগল না। ম্যানেজার করুণ গলায় বললেন—বেচারা কষ্টে পড়েছে, ওকে নিয়ে নিই, কি বলো ? এককালে নাম ছিল। আমি বললাম—কি নাম ? ম্যানেজার বললেন, এখন আর কি চিনবে ? কুড়ি বছর আগে যদুপতি করের নামে হাউস ফুল হয়ে যেত।

আমি থাকতে পারলাম না, প্রশ্ন করলাম, আপনি নিয়ে নিলেন ত' তাঁকে ?

শ্রীমতী মাথা নেড়ে বললেন—নিশ্চয়ই, তবে অভিনেতা হিসাবে নয়, তিনি এখন আমার হিসাবপত্তর দেখেন। কিন্তু এসব ছাপবেন না। তিনি কষ্ট পাবেন।

রিপোর্টারের মুখ কালো হয়ে গেল, তিনি বললেন, অন্ততঃ গোড়ার দিকটা—

—একটি লাইনও নয়। একটি কথাও ছাপা চলবে না—ওঃ, মাথাটা গেল—এই বলে উঠে গিয়ে শ্রীমতী জানালাটা খুলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

জয়দেব বাবুও উঠে দাঁড়ালেন, সেই সঙ্গে আমরাও ;

জয়দেববাবু বললেন—আজ বরং যাই শ্রীমতী ! তোমারও শরীরটা তেমন ভালো নাই।

না না, যাবেন না কথা আছে, মুশকিল হয়েছে শরীরটা তেমন সুবিধে নেই। আবার চেয়ারে বসে পড়েন শ্রীমতী, যেন প্রাণহীন, নিস্পন্দ ! বললেন—শরীরে জোর নেই এতটুকু।

আমরাও বসে পড়ি আবার, শুধু রিপোর্টার ত্রিপাঠীজী দাঁড়িয়ে রইলেন। রিপোর্টার একটু কেশে বললে—মাপ করবেন, কিন্তু—

তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী বল্‌লেন : বসুন না ! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? আমার কথায় কিছু মনে করবেন না। আমার চিরদিনই এই হাল। কি শৈল, তাই নয় ?

শৈল তখন পাশের ঘরে, সুটকেস্ গোছাচ্ছে। শুধু বল্‌ল—যাই দিদিমণি !

আবার গলায় থ্রোট্-স্প্রে লাগিয়ে চঞ্চলা শ্রীমতী রিপোর্টারের প্রতি করুণা করেই যেন বল্‌লেন : বসুন, আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন কি ? এ প্রশ্নটা নিশ্চয়ই আগের চেয়ে জোরালো !

গলাটা পরিষ্কার করে ত্রিপাঠীজী বল্‌লেন : কিছু যদি মনে না করেন, আপনার সব চেয়ে বিশ্রী অভিজ্ঞতাটা কি তাই বলুন। আমাদের পরের ইস্যুতে বিখ্যাত অভিনেতারা সবাই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন,…

ভদ্রলোক বেশ উৎসাহভরে বলে চলেছেন, শ্রীমতী হঠাৎ স্প্রেটা টিপয়ে সজোরে নামিয়ে রেখে মুখে হাত চাপা দিয়ে বেদনার্ত ভঙ্গীতে বিশ্রী হাসতে থাকেন।

কারো পানে না তাকিয়েই—শ্রীমতী আপন মনে বলেন—বাবা ! কি ভয়ংকর প্রশ্ন ! জয়দেব বাবু, এই সব বাচ্চা রিপোর্টাররা যা খুশি প্রশ্ন করে যায় নয় কি ? সত্যি কথা যদি কেউ বলে ত' এরা বুঝতে পারে, কেউ ত' তা বলে না। বিশ্রী অভিজ্ঞতা ! ....শ্রীমতীর হাতদুটি তখনও চোখের ওপর। আবার তাঁর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল, আমার জীবনের বিশ্রী অভিজ্ঞতা ! যদি বলি বিশ্বাস করবেন না, ছাপতে পারবেন না—কি প্রশ্ন ! উত্তর দিলেই বুঝবেন.... আমার অভিজ্ঞতা ! বেশ বল্‌ছি শুনুন, সত্যি কথাই বল্‌ব…

একটু থেমে শ্রীমতী আবার বল্‌লেন—বিয়ের পর দু'-তিন সপ্তাহ কেটেছে, আমরা কাশী গিয়েছিলাম...ফাল্গুন মাস, কাশী আর গঙ্গা!...

আমি আর আমার স্বামী দু'জনে চাঁদনী রাতে একটা নৌকা ভাড়া করে গঙ্গার বুকে বেড়াচ্ছি। উনি মাঝে মাঝে গাইছেন—

"কথা ছিল এর তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে, কেবল ভেসে—"

নিস্তরঙ্গ নদী—ওদিকে কাশীর ঘাট, নদীর জল এমনই পরিষ্কার যেন জলের ভিতর দশ-বারো হাত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। রাত হয়েছে, চতুর্দিক স্তব্ধ, যেন সার্কাসের বাজনা সহসা থেমে গেছে, আকাশ থেকে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে, আমরা বেড়াচ্ছি,—নিরুদ্দেশ যাত্রা।

শ্রীমতী যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বল্‌ছেন। চোখে তেমনি হাত চাপা।

শ্রীমতী বলে চলেছেন—আমার মনে আছে, দু'জনেরই শাদা পোষাক, ওর গায়ে শাদা পাঞ্জাবী, আর আমার পরেন শাদা শান্তিপুরী শাড়ি। উনি মাঝির পাশে বসে গান গাইছেন, আমি চুপ করে শুয়ে তাঁকে দেখ্‌ছি। পরম রূপবান ছিলেন তিনি। আমি চোখ বুজে শুয়ে আছি,—দাঁড়ের ছপ্‌ ছপ্‌ আওয়াজ, দূর মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ শুন্‌ছি, চোখ বুজে শোনা, চোখ চেয়ে দেখার চাইতেও ভালো। এমন সময় কাশির আওয়াজ, উনি কাশছেন। প্রথমটা খেয়াল করিনি। কিন্তু কাশি আর থামে না, সেই নৈশ স্তব্ধতা ভেদ করে কি ভয়ংকর শব্দই না শোনাচ্ছে! আমি চোখ খুলে উঠে বসলাম, দেখি যে উনি নৌকার পাশে হেলে পড়ে অবিরত কাশছেন—শ্রীমতী একটু থামলেন, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলেন—তারপর চাঁদের আলোয় নদীর বুকে দেখি দীর্ঘ লাল রেখা, রক্তের সুদীর্ঘ লাইন...

শ্রীমতীর গলার স্বর থেমে গেল, তিনি স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে চুপ করে বসে রইলেন। সমস্ত ঘরটিতে একটা অখণ্ড নীরবতা, শুধু মাথার ওপর ফ্যান ঘোরার শব্দ। সহসা শ্রীমতী মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন, তাঁর চোখ বেয়ে প্লাবন নেমেছে।

শ্রীমতী বললেন ঃ দেখুন, এ অনেক দিনের ঘটনা, এ সব আর ছাপাবেন না। তারপর অনেক কিছু ভালো-মন্দ ঘটে গেছে, কিন্তু এই আমার সব চেয়ে বেয়াড়া অভিজ্ঞতা।

শ্রীমতী উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ত্রিপাঠীজীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আচ্ছা, এইবার এঁদের সঙ্গে একটু কথা বলব।

রিপোর্টার উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখ মুখ আচ্ছন্ন, মনে অস্বস্তি, মুখে বললেন—নমস্তে—সত্যি আমি বড় দুঃখিত।

শ্রীমতী বললেন ঃ না, তার জন্য কিছু নয়, আপনি পুরানো কথা মনে করিয়ে দিলেন ত্রিপাঠীজী।

—কিন্তু আর একটা ইনটারভিয়ু চাই যে, শ্রীমতীজী!

—আচ্ছা হবে'খন, আজ আমার শরীরটা ভালো নেই।

ত্রিপাঠীজী চলে গেলেন। শ্রীমতী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, আজ আবার ল-মেম্বার স্যার ডি, এল আমাদেস সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছেন। এত বিশ্রী লাগছে, কিন্তু যেতেই হবে। তিনিই ত' বড়লাটকে অভিনয় দেখাতে এনেছিলেন। জয়দেববাবু, কাল আসুন না, একসঙ্গে কোথাও গিয়ে লাঞ্চ খাব। অনেক কথা আছে!

জয়দেব বাবু বললেন—তার চেয়ে ওখলা বা কুতুবে গেলে বরং ভালো হ'ত। গ্রামের দিকটাও কিছু দেখা হ'ত!

—আমাকে আর পাখি আর জঙ্গলের কথা বলবেন না, ওতে আমার মনের জ্বালা বাড়ে। বিছানা, জয়দেববাবু বিছানাই মানুষের একমাত্র বন্ধু—চুপচাপ শুয়ে থাক্‌লে অনেক কষ্টের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আমি তাই বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছি। এতক্ষণে আবার আমার কথা মনে হল। বললেন ঃ সত্যি ছেলেটি সঙ্গে কথাই হ'ল না, কি নাম ভাই তোমার? —চমৎকার চোখ দুটো। আর একদিন ওকে নিয়ে আসবেন।

—ও একজন ভালো অভিনেতা, এখানকার সখের দলে অভিনয় করে নাম কিনেছে, তোমার একজন ভক্ত, ছেলেবেলা থেকেই নাকি তোমার পার্ট দেখছে।

—তাই নাকি! পাবলিক ষ্টেজে যদি নামো কোনো দিন হয়ত তখন দেখা হবে। তবে ভাই, এ পথে এসো না। দূর থেকেই ভালো। এলে বুঝতে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা!

জয়দেববাবু বললেন ঃ আঃ শ্রীমতী, অমন করে একে ভয় পাইয়ে দিও না। তুমি যেন কি হয়ে গেছ!

—অমলেশের কথা মনে আছে, জয়দেববাবু ?—সহসা, শ্রীমতী প্রশ্ন করল !

—হ্যাঁ, খুব আছে !

—কাল তার কথা বলব আপনাকে, আমি আর বেশী দিন এ লাইনে থাকব না জয়দেববাবু, আমার মত অভাগা আর পৃথিবীতে নেই। আবার শ্রীমতীর চোখে জল।

আমার দিকে চেয়ে শ্রীমতী বললেন ঃ আচ্ছা আবার দেখা হবে।

আশীর্বাদের ভঙ্গীতে গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ভালো হবে তোমার, আবার দেখা কোরো। তোমার নাম কি ভাই.......

আমি নাম বলতে যাচ্ছি, এমন সময় শ্রীমতী শৈলকে ডেকে বললেন—কাল জয়দেববাবুর সঙ্গে যাবো, মনে থাকে যেন। আর একদিন এসো, অনেক কথা হবে।

—আপনি যা ব্যস্ত, আপনার কি সময় হবে ? আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

—ব্যস্ত বটে, কিন্তু বন্ধু আমার একটিও নেই। তুমি এসো।

আমি সলজ্জ কণ্ঠে বলি ঃ চিনতে পারবেন ?

—আমি কখনও কারো মুখ ভুলি না। কি শৈল, বল্ না ?

শৈল দরজা খুলতে খুলতে বলে—কখ্‌খনো কিছু ভোলে না দিদিমণি, সেই ত, ওনার দোষ।

পরের বছর শ্রীমতী সিনেমায় নামলেন' ষ্টেজের মত টকির সেই প্রথম যুগে শ্রীমতীর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, হিন্দী ও বাঙলা ছবিতে তাঁর কি সুনাম ! আমি কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি তখন নেই, শীগগিরি বম্বে যাবেন তারই আয়োজনে ব্যস্ত। মনে মনে জানি নিশ্চয়ই আমাকে চিনবেন না, তবু সন্ধান করে তাঁর বম্বে যাবার দিন হাওড়া ষ্টেশনে হাজির হলাম। ক্যামেরাম্যান, ইমপ্রেসারিও নট-নটী ছেলে-মেয়ে বুড়োয় প্লাটফরম ভর্তি ! ফুলের মালায় কামরাটা ছেয়ে গেছে। আমি পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছি, হঠাৎ শ্রীমতীর চোখ পড়ল। তিনি তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন ঃ এই যে জয়দেবের বন্ধু ! তিনি আসেননি ?

আমি মৃদু গলায় বললাম—কিছু ফুল এনেছিলাম, আপনাকে দেব। কথাটা কৈফিয়ৎ হিসাবে বলে হাতে ফুলগুলি এগিয়ে দিলাম।

শ্রীমতী ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন।

—রজনীগন্ধা! রজনীগন্ধা! শৈল তাড়াতাড়ি ফেলে দে। ফেলে দে। কোথায় ছিল শৈল, সে ফুলগুলি এক রকম কেড়ে নিয়ে চলে গেল! আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—ঐ ফুল বুঝি ভালো নয়?

—ভয়ংকর ফুল, তুমি নিশ্চয়ই জানতে?

—সত্যি আমার জানা ছিল না, ষ্টেশন থেকেই কিন্‌লাম, হয়ত আপনার ভালো লাগবে এই ভেবেছিলাম। জয়দেবদা বলেছিলেন আপনার আসল নাম রজনী, তাই রজনীগন্ধা এনেছিলাম!

—বুঝেছি ভাই, বুঝেছি। আমার হাত দুটি চেপে ধরেছেন শ্রীমতী, চোখে সেদিনের মত জল। এই জনসমারোহের মধ্যেও কেমন আত্মবিহ্বল হয়ে গেলেন শ্রীমতী! আমার হাতদুটি সেইভাবে কিছুক্ষণ ধরে থেকে বললেনঃ তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই, ঐ নামের জন্যই ত' আজ আমার এই অদৃষ্ট, সমুদ্রে ডুবে আছি জল পাই না, সুখের সাগরে আছি তবুও এত অসুখী!

জননী

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে জগন্নাথ চক্রবর্তী যা কিছু সহজ, স্বাভাবিক এবং করণীয় সেইসব কর্মই করে এসেছেন। ছোটবেলায় উপযুক্ত স্কুলে এবং য়ুনিভার্সিটিতে শিক্ষালাভ করেছেন; খেলার সময় খেলেছেন এবং পড়ার সময়ে পড়ে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েই বেরিয়েছিলেন। শিক্ষাপর্ব সমাপ্ত করে কর্তব্যপরায়ণ সুবোধ বালকের মত পৈতৃক এটর্ণা ব্যবসায় যোগ দিয়েছেন এবং পিতৃ নির্দেশে আজকালের তুলনায় একটু কম বয়সেই বিবাহও করেছিলেন। অল্পকালের ভেতর তিনটি সন্তানের পিতা হয়ে সংসার-সমরাঙ্গণে পাকাপাকিভাবেই নেমেছিলেন। তারপর বয়সের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মেদবৃদ্ধি হ'ল, মাথার চুল কমে গিয়ে টাক দেখা গেল।

জগন্নাথ বাবু সারা সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করতেন আর রবিবার হলেই বেলগাছিয়ায় আত্মানন্দ ঠাকুরের কাছে গিয়ে তত্ত্বকথা শুনতেন। দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে চাঁদা দিয়েছেন, একবার জেলেও খেটেছিলেন পিকেটিং করে, আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দক্ষিণপন্থীদেরই ভোট দিচ্ছেন। পাড়ার সার্বজনীন দুর্গোৎসব আর পাবলিক লাইব্রেরী সর্বত্রই তাঁর সমান সম্মান। এক কথায় তিনি খাঁটি বাঙালী চরিত্রের একটি আদর্শ নমুনা,—উন্নতিশীল, সাদাসিধে আশা-আকাঙ্ক্ষাহীন মানুষ,—চারপাশের জীবন সম্পর্কে নির্বিকার। তবু তাঁর এই পঞ্চাশের সীমানায় এসে তিনি স্থির করেছেন একটা কিছু করবেন,—সংসারে অসীম বিরাগ। একটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এখান থেকে সরে পড়বেন, মহিলাটি আর কেউ নয়। পরস্ত্রী নয়, জগন্নাথেরই সহধর্মিণী।

ক্রমশঃই সব কিছু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এমনটা যে হবে কে জান্‌ত! হাইকোর্ট পাড়া থেকে বেরিয়ে প্রতিদিন আউটরাম ঘাটের কাছে এসে গাড়ি ছেড়ে দিতেন জগন্নাথ, তারপর সেখান থেকে গঙ্গার ধার ধরে আস্তে আস্তে চ্যাপেল রোডের বাড়িতে এসে পৌঁছতেন,—শরীর রাখবার জন্য এই ব্যায়ামটুকু প্রতিদিন করতেই হয়। পথ চলতে চলতে সংসারের চিন্তাই

করছিলেন জগন্নাথ, সত্যি—সবটাই আমার নিজের দোষ,—বাপ-মা হিসাবে আমি বা অন্নপূর্ণা দু'জনেই একেবারে কিছু নয়। অতি নরম আমাদের প্রকৃতি, দুর্বল চরিত্র আর সাদাসিধে! তবু আমরাই যদি ওদের খারাপ করে থাকি,—আমাদেরই যদি ত্রুটি হয় তবু, তবু ওরা এমন হয়ে উঠবে—! ওদের কোনো কর্তব্য নেই। দুটি পণ্ডিত আর একটি আর্টিষ্ট! একেবারে 'ইনটেলেক্‌চুয়্যাল' বড় ছেলে আর রমলা, ছোট মেয়ে অমলা অবশ্য ওদের চেয়ে অনেক ভালো, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা।

মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে জগন্নাথের পথ চলার ক্লান্তিতে নয়, চিন্তায়। সবই সইত, কিন্তু ওরা যেন ইদানীং আর তাঁকে গ্রাহ্য করে না। জগন্নাথকে তারা শিশুর মতো দেখে, যেন সে কিছু বোঝে না, জানে না। এইখানেই জগন্নাথের আপত্তি। এ সবই ক' বছর ধরে উনি সহ্য করে আসছেন,—ওদের অভব্যতা, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মেতে থাকা, বাপ-মার প্রতি উদাসীনতা সবই যেন বেড়ে উঠছে।

মুখ লাল হওয়ার কারণ সহসা জগন্নাথের যৌবনের কথা মনে পড়েছে। ওরা সবাই যৌবন সম্পর্কে সচেতন, উদ্দাম যৌবনের স্পর্শ ওদের দেহে-মনে,—পুরাতন পৃথিবীর প্রতি ওদের অসীম আক্রোশ,—পুরাতনের দল নাকি পৃথিবীর শান্তি ও স্বস্তি নষ্ট করেছে। জীবনের প্রতি ওদের যে জন্মগত অধিকার তা নাকি পূর্বপুরুষের পাপে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। জগন্নাথ দু' বছর জেলে কাটিয়েছেন, স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার, এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁর পক্ষে এ দিনের তরুণের এই অভিযোগ অসহ্য। চুলোয় যাক্ ওদের যৌবন, ধ্বংস হোক ওদের জন্মগত অধিকার। কি করে বলে আমরা কি না ওদের শান্তি নষ্ট করেছি,—এদিকে আমারই পয়সায়, সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আমারই বাড়িতে বসে আমারই দৈনন্দিন শ্রাদ্ধ হচ্ছে।

হেস্‌টিংস অঞ্চলের এই চ্যাপেল রোড অপেক্ষাকৃত শান্ত নির্জন জায়গা,—বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে মনে হ'ল, ভালোই হয়েছে,—আজ আর কেউ বাড়ি নেই,—অমলার বন্ধুরা নাচ-গানের আয়োজন করেছে, সেখানেই সবাই যাবে। বাড়িতে তবু দু'দণ্ড শান্তি পাওয়া যাবে। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বসে দু'টো কথা কওয়া যাবে। অপ্রীতিকর বিষয় চাপা দিতে পারলে জগন্নাথ ভারী খুশি হতেন, তাই গেট খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকতে তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠেছে। কিন্তু

একটু এগিয়েই তাঁকে থামতে হ'ল, নীচের তলা থেকে যে ধরনের কলরব আর অট্টহাস্য ভেসে আসছে তা'তে বেশ বোঝা যায় ওদের নৃত্য-নাট্যের আসর আজ এখানেই বস্‌বে হয়তো।

হলঘরের দরজা খুল্‌তেই দেখা গেল, তিন-চারজন মেয়ে নাচের ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়েছে, চুলে শাদা ফুলের মালা,—আর একজন অপরিচিত ছোক্‌রা তাদের কি করতে হবে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

ওরা কেউ জগন্নাথকে লক্ষ্য করলো না, জগন্নাথও নয়। হাতে ছাতা ছিল সেটি এক পাশে লুকিয়ে রাখলেন, আগে একবার এইভাবেই ছাতাটি গিয়েছিল—তারপর গম্ভীর ভঙ্গীতে ড্রয়িংরুমের দিকে চললেন। সেখানে এস্রাজ সেতার ইত্যাদি নিয়ে এক দল বসেছে। নেপথ্য সঙ্গীতের আয়োজন। অমলাটা একটা সোফার হাতলে বসে আছে,আর সোফায় বসে আছে এক অপরিচিত যুবক, যাক্‌, এ ছোকরার দাড়ি নেই। ওদের বন্ধু-বান্ধবদের দাড়ি রাখাটাই ফ্যাসনে দাঁড়িয়েছে। বিধাতার করুণা,এর দাড়ি নেই। কিঞ্চিৎ স্বস্তি পেলেন জগন্নাথবাবু।

এই ঘরেরই এক প্রান্তে হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছে ইন্দ্রনাথ, মাথার চুল, রঙীন জামা আর কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে এরা সব 'ইন্‌টেলেকচুয়্যালে'র দল। তার কিছু দূরেই পুরুষালি ধরনের চেহারা একটি মেয়ে কার্পেটের সূতো নিয়ে টান্‌ছে, অর্থাৎ কিছু একটা করছে। রমলা আর একটি দলের মধ্যমণি হয়ে বসেছে, কাছে আছে তিনটি ছেলে। মোটামুটি একটা তুমুল কলরব। জগনাথ স্পষ্টই বুঝলেন ওরা কেহই তাঁকে গ্রাহ্য করছে না, বরং বিরক্তি হচ্ছে ওঁর এই অনধিকার প্রবেশ।

জগন্নাথেরও তাই মনে হ'ল, কি করছেন তিনি এখানে তাঁর কি প্রয়োজন কেউ না হয় এগিয়ে এসে বলুক,—'মশাই কি চাই আপনার? ভুল হয়েছে এ বাড়ি নয়।' যাই হোক্‌, একটু থমকে দাঁড়িয়ে তিনি নিঃশব্দে ইন্দ্রনাথের কাছাকাছি পৌঁছলেন, পণ্ডিতের দল কি নিয়ে আলোচনা করছে, কানে যাবে। আলোচনার ভিতরে রীতিমত গরম আবহাওয়া তাই জগন্নাথ অনুমান করলেন শান্তিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। দু'একটা কথা শুনেই অসহিষ্ণু জগন্নাথ ইন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন—"তোমাদের মা কোথায়, বাড়ি নেই?"

মুখের কথা শেষ করে ইন্দ্রনাথ মুখ ফিরিয়ে দেখে বল্‌ল—"এই যে বাবা! তোমার সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে দিই—"

"না বাবা,—পরিচয় করে আর কি হবে! তা তোমাদের মা কই? তাঁকে দেখছি না!"

"আছে কোথায় নিশ্চয়ই।" ইন্দ্রনাথ লঘুভাবে জবাব দিয়ে আবার আলোচনা শুরু করে।

জগন্নাথ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, ওখান থেকে সরে গিয়ে রমলার কাছে গিয়ে বেশ জোর গলায় বললে—"তোমার মাকে দেখেছ?"

উদাসীন ভঙ্গীতে জগন্নাথের মুখের পানে তাকিয়ে রমলা বলল ঃ "মা, মাথা ধরেছে না কি হয়েছে একটা!"

এইটুকু বলে সে আবার আলোচনায় যোগ দেয়।

মনে মনে অভিশাপ দিতে দিতে জগন্নাথ ওপরে উঠলেন। রাগে মুখের চেহারা রক্তিম হয়ে উঠেছে, অন্নপূর্ণাই বা গেল কোথায়!

এতই উত্তেজিত হয়েছেন জগন্নাথ, যে বার বার মাথার ঘাম মুছলেন। দরজা খুলে দেখা গেল, শোবার ঘরে চুপ করে বসে আছেন অন্নপূর্ণা। মাঝে মাঝে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছছেন। জগন্নাথ কিছুক্ষণ তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, কপালের কুঞ্চিত রেখা সত্ত্বেও কত শান্ত সুন্দর ঐ মুখ! কিন্তু হঠাৎ এভাবে মুখ মোছার হেতু কি, এই অসময়ে?

মনের কথা চেপে বেশ শান্ত ভঙ্গী করে জগন্নাথ বললেন—"নীচে ওদের কি সব হচ্ছে? নাচ-গান হল্লা?"

"—রমলা বলল এখানেই হোক্, বাবা কিছু মনে করবেন না।"

"—আর তোমার অনুমতি নিয়েছিল কি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়েছিল বৈ কি! নিয়েছিল!"

অন্নপূর্ণা কখন মিথ্যা বলে জগন্নাথ ঠিক ধরতে পারতেন, "তাই আর কিছু বললেন না। শুধু বললেন "কিন্তু তুমি কাঁদছিলে কেন অন্ন?"

"না না কাঁদিনি, কাঁদবো কেন?"

কিন্তু এই কথাগুলি বলার সঙ্গে, আবার চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। অতিকষ্টে অন্নপূর্ণা বললেন—"আমারই বোকামি,—এমনি কেমন চোখ দিয়ে জল পড়ছে কিন্তু ওরা যেন বাড়িটা কি করে তুলেছে!"

জামাটি ছেড়ে রেখে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে ওর পাশে বস্‌লেন

জগন্নাথ; কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইলেন—ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে তার সাফল্যহীন কর্তৃত্বের গ্লানিকর অধ্যায় চিন্তা করতে লাগলেন, আশা ছিল ইন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে ব্যারিষ্টারীটা অন্ততঃ পাশ করবে, কিন্তু সে গ্রাজুয়েট হয়েই একটা দিক্‌পাল হয়ে উঠেছে, এম-এ ক্লাসে নাম আছে, শোনা যায়, সারাদিন তার কফি হাউসেই কেটে যায়। ওদের প্রতি কোনো দিন কোনো কড়া কথা বলা তার সাধ্য নয়, কখনো লাইব্রেরী ঘরে কাউকে ডেকে দু'-চার কথা যে বলবেন সে উপায় নেই, ইন্দ্রনাথ রমলা বা অমলা সকলেই বলে—"একটা কাজ আছে বাবা, কথা দিয়ে রেখেছি।" সুতরাং জগন্নাথ কিছু বলার আগেই তারা সরে পড়ে। আর ইন্দ্রনাথ বা রমলা, ওদের সঙ্গে কথা বলাই দায়, ওরাই শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা শুরু করে। ওদের কথা শুনে মনে হয়, বেকারত্ব, অভাব, মহাযুদ্ধ সব কিছুই যেন জগন্নাথের অপরাধ, এ সবের জন্য তিনিই দায়ী। সুতরাং তাঁর সন্তানরা যদি দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর অবিচার দূর করে একটা স্বাভাবিক, সহজ এবং প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তুলতে পারে তার জন্য পিতৃত্বের অধিকারে জগন্নাথের বাধা দেওয়া উচিত নয়।

হঠাৎ অন্নপূর্ণা বলে উঠলেন—"দেখো, ওরা ছেলেমানুষ, ওদের ওপর এতটা কঠোর হওয়া ঠিক নয়।"

তখন তার মুখে হাত চাপা দিয়ে জগন্নাথ বললেন—"না, অন্ন, তুমি ওকথা বোলো না,—ওদের হয়ে যদি একটা কথা বলো তাহলে এই বুড়ো বয়সে কিন্তু আমি একটা কাণ্ড করে বসবো। হয়ত ওদের ক্ষমা করতাম, ক্ষমা করতে পারতাম, কিন্তু ওরা যা করছে তারপর আর আমার সয় না। জানো আজ আমাদের কি অবস্থা! তোমার আমার আজ আর কোন জায়গা নেই, এ বাড়িতে আমরা আজ অবাঞ্ছিত, আমাদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে"—

অন্নপূর্ণার চোখ দিয়ে যেন বর্ষার ঝরণা-ধারা প্রবাহিত হচ্ছে,—জগন্নাথ কি ভেবে একটু চুপ করলেন।

তারপর আবার শুরু করলেন—"হয়ত তুমিও অবস্থাটা বোঝো,—তুমিও সব জানো—তবু ওদের কথা কিছু বলতে চাও না, কিন্তু আর কিছু ভাববার নেই, আমাদের আর বেশী দিন এভাবে থাকলে হয়ত অপমানিত হতে হবে।"

অন্নপূর্ণা বললেন—"ওদের জন্যই আমার চিন্তা, ছেলেটার কিছু হোল না, মেয়ে দু'টো বড় হয়েছে"—

"কিছু ভেবো না, ভাবনার সময় চলে গেছে,—এখন আর কিছু করবার নেই।"

"বুঝেছি, সব বুঝেছি, ওরা যদি শুধু একটু বুঝতো।"...

"ওদের কোনো দায়িত্ব নেই, সবই ঠিক মত চলে যাবে তাই এই অবস্থা, দায়িত্ব যদি ওদের কাঁধে পড়ে তখনই ওরা জব্দ হবে, এই সব বাউণ্ডুলেপনা ঠাণ্ডা হবে।"

জগন্নাথের কণ্ঠস্বরে এমনই একটা সুর ছিল যে কান্না থামিয়ে সচকিত হয়ে অন্নপূর্ণা তার মুখের দিকে তাকালেন। উদ্বেগভরা কণ্ঠে বললেন—"তুমি কি সত্যি একটা কিছু করবে ঠিক করেছ?"

হেসে উঠে জগন্নাথ বললেন—"না, তেমন গুরুতর কিছু নয়, তবে দিন কতক এই আবহাওয়া ছেড়ে ঘুরে আসাই ভালো,—তুমি যেন দিন দিন বুড়ি হয়ে যাচ্ছ অন্ন...."

আয়নায় মুখটা একবার দেখলেন অন্নপূর্ণা। বলেলন—"আমার ত' বুড়ো হয়েছি বলে মনেই হয় না। আমার এখনও মনে হয় সেই কুড়ি বছরে আছি।"

"আমারও ত' তাই মনে হয়, তোমার যখন আঠারো বছর বয়স তখন আমাদের বিয়ে হয়েছিল। তোমার মনে আছে কিছুতেই বাপের বাড়ি ছেড়ে আস্‌তে চাইতে না, কি কান্না! এক রকম জোর করে তোমাকে আন্‌তে হ'ত।"

"বড় বোকা ছিলাম তখন!"

"তখনও বড় ভালো ছিলে এখনও তাই। মাঝে মাঝে মনে হয় আবার যেন সেই রকম নতুন করে পাই তোমাকে, পিছনে পড়ে থাক্‌বে জীবনের অভিজ্ঞতা আর সামনে থাকবে উজ্জল ভবিষ্যৎ। আবার নতুন করে জীবনটাকে শুরু করবো। সেতারের যেমন তার বাঁধে।

অন্নপূর্ণা ওঁর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে, জগন্নাথের চেহারাটা দেখে তার মায়া হয়।

অন্নপূর্ণা তাই জগন্নাথের মনের মেঘ কাটাবার উদ্দেশ্যে বললেন—"তুমি কি বুড়ো বয়সে আবার প্রেম শুরু করলে নাকি?"

"হয়ত তাই,—কেন তোমার ভালো লাগছে না?"

"না, তা নয়, তবে এমনই হঠাৎ কথাটা উঠ্‌ল তাই অবাক হচ্ছি, আমি কি তোমার কোনো কথা অপছন্দ করতে পারি?"

"তাহ'লে সব ঠিক হয়ে গেল,—একটা দিন দেখে বেরিয়ে পড়ব!"

"কোথায় ? কি ঠিক হ'ল ?

"কেন কাশীতে, আমরা কাশী চলে যাব অন্ন, আশ্রমে গিয়ে স্বামীজীকেও সব বল্‌ব। এইবার হবে নতুন জীবনের শুরু—"

"হ্যাঁ, নতুন জীবন,—আর এ সব নয়। এখন আমি কাজকর্ম সব ছেড়ে দেব, পরলোক বলেও ত' একটা বস্তু আছে।"

ভয় পেয়ে অন্নপূর্ণা বলল ঃ "কিন্তু আমি কি তা পারবো ? আমি কি রকম নার্ভাস জানো ত ? সংসার ছেড়ে আমি যেতে পারবো না।"

"সত্যি কি সংসার ছাড়্‌ছি,, কলকাতায় হট্টগোল ছেড়ে একটু নিরিবিলিতে ভগবানের নাম করা যাবে, সকালে গঙ্গাস্নান, বিকালে নামকীর্তন, সে এক অন্য জগৎ। কলকাতায় থাকলেই কেবল টাকা আর টাকা, এ একটা বেয়াড়া দেশ, স্বামীজী বলেন, এখানে ভগবান নেই।"

অন্নপূর্ণা সবিস্ময়ে ওর মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

"জানো, অন্ন, সারা জীবন কেবল টাকার সন্ধানে ঘুরেছি, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থা করে আমরা চলে যাব। জানো, আমাদের কি আছে ?"

"ঠিক জানি না, তবে গাড়ি, বাড়ি, আর ব্যাঙ্কে কিছু আছে ত' বটেই।"

"হ্যাঁ, গাড়িটা বেচে দেব, বাড়িটা থাক্‌বে, আর টাকা সত্যি কিছু আছে, ওরা সবাই মাসে মাসে কিছু পাবে, কিছু হাতে থাক্‌বে, আর বাকী যা থাক্‌বে আমি ম'লে আশ্রম পাবে।"

"মাসে তিন শ' টাকা ! সবাই একশো করে। নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক।"

"কিন্তু ওদের সঙ্গে এই বিষয় একটা কথা বলা দরকার....ওরা বড় হয়েছে।"

"কথা অনেক বলেছি,—কথা, কথা, কথা, আর নয়।"

"এই টাকায়, ওরা কি চালাতে পারবে ?"

"তুমি দেবে,—তুমি ত' চিরদিনই ওদের দিয়ে আস্‌ছ !"

"তা বটে, আমি বড়ো দুর্বল।"

"এই ওদের সুবর্ণ সুযোগ, এখনও যদি না পায়ের ওপর পা দিয়ে দাঁড়াতে পারে, কোনো দিন পারবে না। মাথা খাটাবে না,—সুনীতি, ভদ্রতা, সৌজন্য,

শালীনতা সবই অর্থনীতির ব্যাপার,—যৌবন, প্রগতি! ঝাড়ু মারো যৌবনের মাথায়, ওদের কথা শুনলে মনে হবে আমরা যেন বেঁচে নেই।"

"কিন্তু তুমি বড়ো রেগে আছ,—ওরা ছেলেমানুষ, তুমি ওদের যে ভাবে চলতে শিখিয়েছ ওরা সেই ভাবেই ত' চলছে, এখন এত রাগ করছো কেন?"

"রাগ নয়, আমার সহ্যের আর সীমা নেই, অফিস বাড়ি সবই আমার কাছে অরণ্য, আমি বেশ ভেবে দেখেছি এই ওদের একমাত্র পথ,—আমি বড় দুর্বল, নইলে ওদের বাড়ি থেকে কবে তাড়িয়ে দিতাম, কিন্তু আমার মন বড় দুর্বল, ওরা কিছু ভাবে তাও চাই না,—এখন এ আমার সম্মানজনক পশ্চাদপসরণ।"

"তাহ'লে তুমি মনস্থির করে ফেলেছ?"

"নিশ্চয়ই, তুমি কি ভাবছো আমি ঠাট্টা করছি?"

"কিন্তু আমি যে ওদের মা, কি করে ওদের ছেড়ে যাব?"

"থেকেই বা কি করবে তুমি? কি উপকারে আসবে?"

"কিন্তু ওরা যে সবাই এখনও ছোট, সংসারের কি জানে?"

"দেখো, অন্ন,—তোমাকে একটা জিনিস এখনই ঠিক করতে হবে, হয় ওদের সঙ্গে তুমি থাকো আমাকে ছাড়ো, নয় ওদের ছাড়ো, আমার সঙ্গে চলো। তা ছাড়া আমি এমন একটা কিছু অদ্ভুত কাণ্ড করছি না, আমার বয়সী হাজার হাজার লোক এ কার্য করেছেন, মুনিরাও তাই বলেছেন। পঞ্চাশের পর সংসারে থাকা উচিত নয়। আমি ত' অন্য কাউকে নিয়ে যেতে চাইনা, শুধু তোমাকে চাই।"

"কথাটা ঠিক, ওরা আমাদের সন্তান, ওদের ওপর একটা কর্তব্য ত' আছে?"

"বেশ ঠিক করার আগে তুমি একটা কাজ করো।"

"কি কাজ?"

"একবার নীচে যাও, ওদের মধ্যে বেড়িয়ে এসো, ইন্দ্রনাথের বন্ধুদের বক্তৃতা শোনো,—রমলার বন্ধুদের গল্প শুনে নাও আর সেই সঙ্গে অমলার দাড়িহীন নতুন বন্ধুটিকেও দেখে এসো।"

"বেশ তুমি যখন বলছো যাচ্ছি।

অনেক পরে ফিরে এলেন অন্নপূর্ণা।

খাঁচার ভেতর বাঘ যেমন পায়চারি করে তেমনই উত্তেজিত ভঙ্গীতে ঘুরছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী। ওঁকে দেখে প্রশ্ন করলেন—"কি দেখলে?"

"যা, বলেছিলে তাই। তোমার কথাই ঠিক।"

"অর্থাৎ আমাদের দিন ফুরিয়েছে।"

"তবে একটা কথা আছে, সে অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে।"

"কি ?"

"ওদের টাকাটা কিছু বাড়িয়ে দাও।"

"বেশ তাই হবে।"

জগন্নাথ চক্রবর্তী জানতেন না যে, তিনি কত দুর্বল,—মাঝে মাঝে স্বীকার করলেও এ কথা কোনো দিন তিনি ভাবেননি যে আবার তাঁর দুর্বলতা ঘট্‌তে পারে। যাই হোক্‌, অন্নপূর্ণার সঙ্গে কথা বলার পর তিনি মনে করেছিলেন যে সব ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে তা হ'ল না। অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে, মনে হ'ল প্রতি তিন মাস অন্তর তিনি ছেলেমেয়েদের ত্যাগ করবেন স্থির করতে লাগলেন, আসলে কিছুই হ'ল না।

কিন্তু এমনই অবস্থা যে, পরবর্তী সপ্তাহগুলি অত্যন্ত বিশ্রীভাবে কাট্‌তে লাগলো, রীতিমত নাটকীয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঘটনার পর ঘটনা ঘটে যায়। ইন্দ্রনাথ এবং রমলার এক পাকিস্তানী বন্ধু এসে হাজির হ'ল,—সে এই বাড়িতেই এক রকম আস্তানা নিল। তার লেখা দু-একটা নাটক স্থানাভাবে এ বাড়িতেই অভিনয় করার ব্যবস্থা হ'ল, অভিনয়ও চমৎকার, যেমন কুৎসিত তেমনই উদ্ভট! এর সঙ্গে তাল রেখে চল্‌লো অমলার কাণ্ডজ্ঞানহীন প্রেমলীলা, সেই দাড়িহীন আর্টিষ্ট সমানে আস্‌ছে।

ফলে, জগন্নাথ চক্রবর্তীর সহ্যের সীমা বাঁধ ভাঙলো, একদিন অত্যন্ত আকস্মিকভাবে ওঁরা সস্ত্রীক কলকাতা শহরের মোহ ত্যাগ করে চলে গেলেন। ছেলেমেয়েরা ব্যাপারটি ঠিক বুঝলো না, কিন্তু বিশেষ দুশ্চিন্তায় পড়লো তাও মনে হ'ল না। তারা তখন বিশ্বজনের কল্যাণে মত্ত হয়ে উঠেছে, অত চিন্তার সময় নেই। মাসিক বন্দোবস্তের কথা শুনে ইন্দ্রনাথ বলেছিল—চিরকালই সব বিষয়ে বাবার নজরটা ছোটো। এই টাকায় আজকের দিনে চলে ?

কাশীর পুণ্য-পরিবেশে জগন্নাথ চক্রবর্তীর বয়স যেন কমে গেল, প্রতিদিন গঙ্গাস্নান, দেবদর্শন আর সন্ধ্যায় নাম-কীর্তন, সংসারের জ্বালা নেই, ঐশ্বর্যের

মোহ নেই,—এ কি কম আনন্দ! তবু মনে কষ্টও আছে, একটা অত্যন্ত স্বার্থপরের মত কাজ করেছেন তিনি, সব ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন। পালিয়ে আসতে পেরেছেন বলেই আনন্দ, মুক্তির আনন্দ।

আর কষ্ট অন্নপূর্ণার জন্য, সে বেচারা এই মুক্তির আস্বাদ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি। স্বামীকে এই একান্তভাবে পাওয়ার অবশ্য আনন্দ আছে তবু ছেলেমেয়েদের ছেড়ে মনে সুখ নেই। ব্যাপারটি হয়ত সহজ হ'ত যদি ছেলেমেয়েরা ওঁদের এই আকস্মিক অন্তর্ধানে মুষড়ে পড়তো,—যদি কাশীর আশ্রমবাসী সাধুরা দু' হাত বাড়িয়ে জগন্নাথকে গ্রহণ না করতেন,—আর···

জগন্নাথবাবু ভাবজগতের লোক, তিনি আশা করেছিলেন ছেলেমেয়েরা হয়ত আকুল হয়ে উঠবে, আর তাঁকে ম্লান মুখে ফিরতে হবে। কিন্তু এসব কিছুই হ'ল না। কলকাতা থেকে জগন্নাথের বাল্যবন্ধু হরিদাস মজুমদার গোপন চিঠিতে সব সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথ এবং অমলা জগন্নাথবাবুর আকস্মিক সিদ্ধান্তে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে বিশেষ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছে আর অমলা একটু কান্নাকাটি করেছিল প্রথমটায় তারপর সেই দাড়িহীন আর্টিষ্টার সঙ্গে সরে পড়েছে, বিয়ে হয়েছে বলে মনে হয় না। ইন্দ্রনাথ আর রমলা পার্টির কাজে আহার-নিদ্রার সময় পাচ্ছে না, মনে হয় তারা বড় ব্যস্ত। কি একটা সাংস্কৃতিক উৎসবের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইন্দ্রনাথের ঘাড়ে। চিঠিটা পড়ে স্তম্ভিত হয়েছিলেন জগন্নাথ। তাঁর সমগ্র পরিকল্পনা তাসের ঘরের মত যেন ভেঙে পড়েছে,—বিশেষ করে এই ঘটনার শুধু অর্থনৈতিক দিক নয়, নৈতিক দিকটাই তাঁকে উৎপীড়িত করছে বেশী।

এই রকম মানসিক অবস্থায় মানুষ আরো বেশী করে ঠাকুর-দেবতাকে আঁকড়ে ধরে,—জগন্নাথবাবু গঙ্গাস্নান ও পূজা-পাঠে আরও বেশী মন ঢেলে দিলেন, আশ্রমবাসীদের কায়িক ও আর্থিক সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করতে লাগলেন। শুধু যদি অন্নপূর্ণা আর একটু ভক্তিমতী হ'ত, কি চমৎকারই না হ'ত!

এইভাবেই দিনের পর দিন কাট্‌ছে, বৈচিত্র্যহীন জীবন। হঠাৎ একদিন সকালে চেঁচিয়ে উঠলেন জগন্নাথবাবু হাতে একটি পুরু খাম।

আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে চীৎকার করতে থাকেন জগন্নাথবাবু—"অন্ন,—দেখো কি এনেছি! কি কাণ্ড দেখো।"

অন্নপূর্ণা ভাবলেন—হয়ত কাশীর বেগুন কিংবা আর কোনো খাদ্যদ্রব্য, কিন্তু

বেরিয়ে এসে দেখলেন, জগন্নাথবাবু একখানি চিঠি হাতে নিয়ে নাড়ছেন। অন্নপূর্ণাকে দেখে বলে উঠলেন—"হরিদাসের চিঠি, কি খবর জানো ? সত্যি ভালো খবর, বুঝলে ?"

"কি হ'ল, ছেলেরা বুঝি দেখা করতে আস্‌ছে ?"

"না, তা নয়, পড়োই না, ভালো খবর, অমলার যমজ সন্তান হয়েছে, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে—"

"হা ভগবান, শেষকালে এ সব কেলেঙ্কারিও কপালে ছিল !"

"কেলেঙ্কারি আবার কি হ'ল ? সেই আর্টিষ্ট ছোকরা ত' ওকে বিয়ে করেছে, সে শুন্‌লাম বড় ঘরের ছেলে, বিলেত থেকে পাশ করে ফিরেছে, ঐ রকম বাউণ্ডুলে সেজে বেড়াত। যাক্, নারায়ণ মুখ তুলে চেয়েছেন—জয় মা ! পড়েই দেখো না ছাই—"

অন্নপূর্ণা সমস্ত চিঠিখানি পড়ে বললেন—"আহা, এই সময়টা যদি কাছে থাকতাম—মেয়েটা আমার বড় ঠাণ্ডা।"

আনমনা হলেন অন্নপূর্ণা।

দৃঢ় গলায় বললেন জগন্নাথ "আমরা ওখানে থাকলে কি আর এ সব হ'ত। আমরা থাকলে কেলেঙ্কারি বাড়ত, কমত না,—ইন্দ্রনাথ আর রমলার কথাটা পড়লে ?"

অন্নপূর্ণা পুনরায় চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়লেন,—এদিকে জগন্নাথবাবু ধারা বিবরণী দিয়ে চললেন—

"ইলেকসনে দাঁড়াচ্ছে ইন্দ্রনাথ, চান্সও নাকি আছে, ওদের পার্টির টিকিট পেয়েছে,—জানতাম কাজকর্ম ওর দ্বারা হবে না,—এই বক্তৃতাই ওর পেশা হ'ল। ওর রাশিচক্রের ফল, লগ্নে কর্কট রয়েছে, হবেই ত', বিলম্বে বিবাহ। যাক্ ভালো হলেই ভালো।"

"ইন্দ্রনাথ আমার ছেলে ত' খারাপ নয়, পণ্ডিত ছেলে।"

"শুধু যা এম-এ'টা দিল না। তা ত' হবেই, পঞ্চমে কেতু রয়েছে কি না, পড়াশোনায় ডোবাবে, তবে পাণ্ডিত্য থাক্‌বে। জানো অন্ন, পঞ্চমে কেতু থাকলে পরের জন্য খেটে মরে। ওর হয়েছেও তাই। তারপর রমলার কাণ্ডটা দেখেছ ? বেটি এম-এ'টা পাশ করেই কেমন কাজটি জুটিয়ে নিয়েছে। ওকে যে প্রিন্সিপাল মিসেস নাগ বড় ভালোবাসতেন।"

চিঠিখানি খামে ভরে রেখে অন্নপূর্ণা বললেন—"সত্যি তোমার বুদ্ধি আছে,—নইলে ছেলেমেয়েরা হয়ত মানুষ হ'ত না।"

জগন্নাথ বললেন—"সংবাদটা ভালো, কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা আমরা আবার এমনই শান্তিতে থাকতে পারছি। আজকের দিনে শান্তি কি কম কথা! স্বামীজী বলেন চিতা আর চিন্তা দুই এক, তবে চিতাটা ভালো, একেবারে পুড়িয়ে মারে, চিন্তা সারা জীবন জ্বালায়।"

কাহিনীর পরিসমাপ্তিটুকু কিন্তু ঠিক পরিকল্পনানুসারে ঘট্‌লো না। জগন্নাথ বাবুর প্ল্যানিং এইখানে বানচাল হয়ে গেল। মনে মনে নিজেকে অত্যন্ত বৃদ্ধ মনে করলেও, যখন কলকাতায় ফিরে এলেন জগন্নাথবাবু তখনও তিনি তেমন বৃদ্ধ হননি। আসলে তাঁর কলকাতা ত্যাগের আড়াই বছর পরের এই ঘটনা। অচিন্তনীয় কাণ্ড ঘটেছে—অন্নপূর্ণা তাঁর সঙ্গে নেই। জগন্নাথবাবু এসে স্বামীজীদের কাছেই আছেন।

ক'দিন জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রেতাত্মার মতো সারা শহরটা ঘুরে বেড়ালেন। এই ক'বছরের সযত্ন-বর্ধিত দাড়ি প্রাক্তন জগন্নাথের আকৃতি অনেকখানি পরিবর্তিত করেছে। একবার চ্যাপেল রোডের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ আর রমলাকে দেখে নিয়েছেন। হরিদাসের প্রদত্ত ঠিকানা মিলিয়ে ডোভার লেনের গায়ে নন্দী স্ট্রীটে অমলাদের বাড়িও দেখে এসেছেন, ভিতরে প্রবেশ করার সাহস নেই।

একমাত্র প্রাণী যে তাঁকে একটু স্বস্তি দিতে পারতো, সে হরিহাস মজুমজার। সে-ও এখন মক্কেলের কাজে বোম্বে গেছে। তাই উদ্দেশ্যহীন হয়ে ঘুরছেন জগন্নাথ। বিকালে য়ুনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুটের সামনে খবরের কাগজের উপর রঙীন কালিতে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে—

"শান্ত শোভাযাত্রীদের ওপর পুলিসের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদকল্পে বিরাট জনসভা। প্রধান বক্তা—ইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ইত্যাদি।"

লোভ সামলাতে না পেরে জগন্নাথ ভেতরে গিয়ে বস্‌লেন! দেখা গেল মঞ্চের ওপর ইন্দ্রনাথ ও রমলা বসে আছে, সভা আরম্ভ হ'ল, প্রথমেই ইন্দ্রনাথের বক্তৃতা—

সহসা জগন্নাথের মনে হ'ল রমলা তাঁর দিকে লক্ষ্য করছে, ইন্দ্রনাথ বসুতেই তাকে কি বললো। জগন্নাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন।

চঞ্চল হয়েছেন জগন্নাথবাবু, মন বড় অস্থির। হ্যারিসন রোডে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির কাছে এক ট্যাক্সিতে উঠে বললেন—"চালাও, বালীগঞ্জ।" এখনই অমলার সঙ্গে দেখা করবেন, এই প্রেতজীবন আর ভালো লাগে না।

কড়া নাড়তেই একটি দাসী বেরিয়ে এল। বোঝা গেল জগন্নাথবাবুকে দেখে সে বিশেষ খুশী হয়নি। সে বল্‌ল—"কাকে চাই?"

"—অমলা আছে? তোমাদের মা ঠাকরুণ?"

"—আছেন, আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

"বলো, একজন বুড়ো মানুষ ডাকছেন।" দাসী চলে গেল।

শ্রান্ত জগন্নাথবাবু একটি চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর আর দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ বস্‌তে হ'ল না। সহসা ঝড়ের মত অমলা এসে হাজির—

"আরে, বাবা! পলাতক বাবার আবির্ভাব!" তার মুখে সেই মোনালিসা মার্কা হাসি।

জগন্নাথের মুখে কথা নেই, অমলা এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পায়ের ধুলো নিল। বলল—"বাবা, সত্যি বল্‌ছি আজ আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে।" তারপর একটু গম্ভীর মুখ করে প্রশ্ন করে—"কিন্তু মা কই?"

অমলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জগন্নাথ বললেন: "তোদের মা আর নেই। গঙ্গায় গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। হরিশ্চন্দ্র ঘাটের সিঁড়িতে পড়েছিল স্নান করে উঠে পরার সাড়িটা আর ছোট্ট একটা ঘটি।"

অমলা চুপ করে রইল ক্ষণকাল, তারপর বল্‌ল—"এই রকম একটা কাণ্ড ঘট্‌বে আমি অনেক আগেই জানতাম।"

—"ইন্দ্রনাথ আসে? রমলা?"

অমলা হেসে বল্‌ল—"ওরা বড় ব্যস্ত বাবা, দাদা আর দিদির পাঁচ কাজে সময় কাটে,—"

"ওদের দেখে এলাম, ইনষ্টিট্যুটে ইন্দ্র বক্তৃতা করছে—"তারপর বললেন, "আমি কিন্তু খুশী হয়েছি মা,—একটা কিছু করা দরকার। আমি থাকলে ওরা কিছুই করতো না। কিন্তু তোমার মা এ সব দেখতে পেলেন না!"

অমলা শুধু বলল—"সবই আমাদের অদৃষ্ট !"

"ঠিক বলেছিস্ মা ! স্বামীজীও তাই বলছিলেন। রাহুর দশা চলছিল, রাহুর শেষটা খারাপ," একটা গোমেদ ধারণ করবো ভেবেছিলাম, তা আর হ'ল না।"

"যাক্, মন খারাপ কোরো না বাবা—চলো তোমার নাতি-নাতনীদের দেখবে চলো।" অত্যন্ত করুণ মুখভঙ্গী করে জগন্নাথ বলল : "না, না, আজ থাক, মনটা ভালো নেই, এখন আশ্রমে ফিরবো।"

—"সে হয় না, এসেছ যখন দেখে যাও। ওরা এখনও জেগে আছে।"

সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে জগন্নাথবাবুকে টেনে নিয়ে গেল—ওপরের তলায় উঠে সামনের ঘরটার দরজা খুলে দিতেই জগন্নাথ দেখলেন—ফুলের মতো সুন্দর দুটি ছেলে-মেয়েকে নিয়ে গণেশজননীর মত যিনি বসে আছেন তিনি স্বয়ং অন্নপূর্ণা !"

অমলা বলল—"মা প্রায় তিন সপ্তাহ এসেছেন, আমি তখনই বলেছিলাম তুমিও আসবে।"

এই কথা বলে আবার সেই অপরূপ ভঙ্গীতে হেসে অমলা নীচে চলে গেল।

বন-হরিণী

তখনও টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। ষ্টেশনের প্লাটফরমের কেরোসিনের কুপি মিট মিট করে দু একটা জলছে, আর সব নিভে গেছে! ষ্টেশন মাষ্টার নিজেই টিকেটবাবু। এগিয়ে এসে গণেশ হালদারের মুখের ওপর হারিকেনটা তুলে ধরলেন। বললেন, ওঃ নবাগত! মশায়ের এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আগমনের কারণ?

বৃদ্ধ গণেশচন্দ্র ষ্টেশন মাষ্টারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন—বাঙালী! তবু যা হোক একটা ভরসা হ'ল! বলেন কেন মশাই, এইখানে পোষ্ট অফিসের চার্জে এসেছি। আপনাদের নতুন মাষ্টারবাবু।

ষ্টেশন মাষ্টার খুব যে পুলকিত হলেন তা মনে হ'ল না, তিনি বললেন—তা জায়গাটা একটু দূর পড়বে। আপনার সঙ্গে এত লটবহর। একটা গরুর গাড়ি নিন। এখানে সাইকেল রিক্স নেই।

গণেশবাবু বললেন—তাও যদি কোডারমায় দিত, শুনেছি জল হাওয়া ভালো, তা নয়, গুজণ্ডি-গরপা, পার হয়ে পাহাড়পুর? শেষের কটাদিন দেখছি আর শান্তিতে কাটাতে পারবো না।

ষ্টেশন মাষ্টার গাড়োয়ানকে বলে দিলেন, বাবুকে নিয়ে যা ডাকঘরের বাড়িতে, নতুন ডাকবাবু।

গাড়োয়ান দুর্বোধ্য ভাষায় বলল—হুঃ।

এইসব গ্রামের লোকের শিক্ষার দরকার। শুধু এখানে বসে পোষ্ট মাষ্টারি করলে চলবে না। আগেও এমন অনেক বেয়াড়া গ্রামে গিয়েছিলেন তিনি। ফেরার সময় সকলে চোখের জল মুছেচে।

ঐ যে হোমিওপ্যাথির দু ফোঁটা জল, ঐ দিয়েই তিনি সবায়ের মন ভুলিয়ে দেবেন। বারকাননার সুদূর পল্লীতে, ভরকুণ্ডা মহুয়ামিলন কি লতেহারের লোকগুলো কি কম শয়তান ছিল। গণেশ হালদার সবাইকে ঠাণ্ডা করেছেন।

খেটেছেন অনেক। কোনো পোষ্টমাষ্টার এত খাটে না। একাই সব, মনিঅর্ডার, চিঠিবিলি, চিঠি লিখে দেওয়া, চিঠি পড়ে দেওয়া সব কাজই তো পোষ্ট মাষ্টারের। মাঝে মাঝে আবার টরে টক্কার মেসেজও আছে। সবাই বলছিল এখানে আর কাজ কি, বেশ মজা করে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোবেন।

গাড়োয়ান হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—'ডাকঘর বাবুজী!' সামনে একটা পাতার ছাউনী। এরই নাম ডাকঘর। এনামেলের প্লেটে ইংরাজীতে লেখা আছে Post Office.

হালদার মশাই বাড়িটি সেই অন্ধকার রাতেই টর্চের সাহায্যে বেশ ভালো করে দেখলেন। এখানেই আবার ডিসপেন্সারী খুলতে হবে। পাশেই একটা খাদ। সেখানে পাথর কাটা হয়ে বোঝা গেল, দু একটা ছোটো ছাউনী রয়েছে—সরু রেল লাইনও বসেছে। একটা ক্রেন ঝুলছে।

হালদার মশাই বললেন 'এই বুঝি সেই মাংটুরামের ষ্টোন করপোরেশন। এরই কাজ দেখছি বেশী হবে! সারাদিন হৈ চৈ হয় না?

গাড়োয়ান শুধু মাথা নাড়ে, পরে বলল, হল্লা হয় বৈ কি, তবে সব দিন কাজ হয় না।

হালদার মশাই ডাকঘরের রুদ্ধ দরজায় ঘা দিলেন। সেই সঙ্গে পাথরের খাদে ডুবার ভয়ংকর আওয়াজ হ'ল, চারদিকে কেঁপে উঠল। ডিনমাইট দিয়ে পাথর ফাটাচ্ছে। হালদারমশাই গাড়োয়ানকে বললেন: হাঁ রে, রাতেও কাজ হয়?

হ্যাঁ হুজুর, বারোটা পর্যন্ত হয়।

দরজায় ধাক্কা দিতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অনেক ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললেন হালদারমশাই।

ঘরের ভেতর কেউ নেই। পাশের ঘরেও কেউ নয়। তারপরই ছোট একখানি মাটির দাওয়া, তার ওপাশে একটা ঘরে সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে। সে দরজাটাও বন্ধ, কিন্তু একটু ঠেলতেই খুলে গেল। সামনেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এক শীর্ণদেহ বৃদ্ধ। বাহ্যজ্ঞানশূন্য এই বৃদ্ধকে সেই আলো অন্ধকারে দেখে চমকে উঠলেন হালদার মশাই—মানুষ না ছায়ামূর্তি।

তখনই হেসে উঠলেন হালদার মশাই, নিশ্চয়ই যামিনী ঘোষ—ওঁকেই ত রিলিভ করতে এসেছেন উনি। হালদার মশাই এগিয়ে গেলেন।

বোধ হয় জুতার আওয়াজে যামিনীর চমক ভাঙে। যামিনীরঞ্জন বললেন, মাফ করবেন। আমি বুঝতেই পারিনি আপনিই এসেছেন। আপনিই ত' হালদার মশাই। আমি আবার কানে কম শুনি!'

হারিকেন ধরে যামিনীরঞ্জন সারা বাড়িটাই দেখায় গণেশবাবুকে। গণেশবাবু মনে মনে যামিনীবাবুর জীবন যাত্রার ধারা সম্পর্কে একটা আঁচ করে নেন।

পরদিন ডাকঘরটিতে বসে কথা হচ্ছিল—গণেশ হালদার প্রশ্ন করলেন—এখানে কাজ কর্ম কি রকম?

বৃদ্ধ বললেন তেমন আর বেশী কি! ফ্যামিলি যদি নিয়ে আসেন তাহলে একরকম কাটবে, না হলে ট্রাবলে পড়বেন। দেখছেন আমি বইটই পড়েই দিন কাটাই। যারা আছে সবাই ঐ খাদে কাজ করে, কিছু চাষীও আছে, তাদের চিঠিপত্রের বালাই নেই। কিছু লোক বাইরে চলে গেছে, কিছু কাজ করে টাটায়, তারাই প্রতি মাসে টাকা কড়ি যা হয় পাঠায়। আর এই মিলের মালিকরা আছেন। ওঁদের কাজই বেশী।

—তা মহুয়ামিলনের চেয়ে ভালো হবে। গণেশ হালদার বললেন।

মহুয়ামিলনে ছিলেন? আহা! চমৎকার জায়গা মশাই।

কেন? সেখানে ছিলেন না কি?

পাঁচ বছর ছিলাম। আমি ত আপনার চেয়ে অনেক বড়। আমার বিয়ের পরই ওখানে যাই। স্ত্রী ছিলেন। আহা সতী লক্ষ্মী।

গদগদ চিত্তে বৃদ্ধ একখানি বিবর্ণ ফটোর দিকে তাকালেন।

গণেশবাবু বললেন, ছিলেন মানে? আর নেই?

—না তাকে রেখে এসেছি লতেহারে। ওখান থেকে যাই লতেহারে, সেইখানেই হঠাৎ কলেরা হয়ে একদিনেই চলে গেল।

গণেশ হালদার চুপ করে রইলেন। বৃদ্ধ পাশের ঘরের কোণে ষ্টোভে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছেন। পাশে দু চারটি হাতল ভাঙা কাপ।

চায়ের জল হওয়ার পর বৃদ্ধ পাশের ঘরে চলে এলেন, বললেন যতই হোক এটা হ'ল অফিস ঘর।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করলেন হালদার মশাই—

—আচ্ছা লোকজন ত তেমন নেই? কাজও কম। শুধু বই পড়েই দিন কাটবে? লোকগুলো কেমন?

—আজ এই দশ বছর পরে বলব এরা কেমন লোক ? বেশ প্রশ্ন করেছেন। মরণকালে হরিবোল।

গণেশ হালদার কথাটি লঘু করে বললেন—মানে বেশ সাদাসিধে লোক এই ত' ?

– হ্যাঁ তাই বটে, সে টুকুই ত ভয়ের কারণ। ঐ জিনিসটা বিশেষ ভয় করি মশাই। কথাটি ভালো লাগে না গণেশবাবুর। বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ ছিটগ্রস্ত হয়েছেন অনেক দিন, এই নির্জন অঞ্চলে আছেন হয়ত তারই ফল।

শান্তকণ্ঠে বৃদ্ধ বলতে সুরু করলেন মহুয়ামিলনের পর পাঠালে লতেহারে। স্ত্রী যখন চলে গেল তখন ট্রান্সফার চাইলাম। কাছাকাছি ঘুরিয়ে শেষটায় দিলে এইখানে। আমি প্রথমটা এসে খুব মিশেছিলুম ওদের সঙ্গে, মাঝে মাঝে ওদের ডেকে ধর্মের কথাও শুনিয়েছি। হিরদে শা যখন সর্দার ছিল ওরা বেশ ঠাণ্ডা ছিল, সে ঘরে যেতে তার জামাই তিতরুটা সর্দার হ'ল। বেটা দিনরাত হাঁড়িয়া খেয়ে পড়ে থাকত। ওদের আবার নানারকম কুসংস্কার আছে জানেন ত'। নূতন লোকজনকে ওরা ভয় করে, বিশ্বাস করে না। পূর্ণিমার দিন রাতে ওদের ঘরে হাঁড়িয়া চলে আর···

—মানে শোর-টোর পুড়িয়ে হৈ চৈ করে এই ত ?

শুধু তাই, ঢোলক বাজায়, হাঁড়িয়া খায়, আর মড়ার খুলিতে সিঁদুর মাখিয়ে পূজোও করে। এই ওদের উৎসব। বুড়ি আছে দু'চারজন,মন্তর দিয়ে ভূত ছাড়ায়, জ্বর সারায়, ওষুধ দেয়, তারা তেমন দুষ্টু নয়। ওরা বদমায়েস, কিন্তু তেমন ক্ষতি-কর কিছু নয়। তবে ঐ আকালুটা শয়তানের বাচ্চা, যেমন চরিত্র তেমনি বুদ্ধি।

হালদার মশাই হাসলেন, বললেন: বনে জঙ্গলে থাকে—বুদ্ধিও তেমনি হবে। উদাসভাবে বললেন: যা বলেন। আমার কেমন মনে হয় যৌবনে সাঁওতালদের দেখেছি, তারা আর যাই হোক অতি সরল। আর এরা বোকা বটে তবে সরল নয়। চরিত্রে অবশ্য সবাই সমান। সব দেশেই এই ব্যাপার। যতই আমরা দুপাতা ইংরাজী পড়ে হৈ চৈ করি না, স্বভাব আমাদের সেই বন জঙ্গলের। শহরের মানুষও যেমন, বনের মানুষও তাই। ধর্ম এদের কাছে স্বপ্ন। দেহ ধর্মই প্রধান ধর্ম।

দেখুন সব মানুষই অল্প বিস্তর দেহের টানেই মজে আছে। ক'জন আর ধর্মের টান বুঝেছে। আপনার মনে হয়ত কষ্ট হচ্ছে ওদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা

দেখে। কিন্তু খবর নিন, নিশ্চয়ই কেউ আছে ওদের মধ্যে, যে সৎ, যে একটা বিরাট শক্তিতে বিশ্বাসী।

কলেজে পড়ার সময় কত বড় বড় কথা আওড়েছি, সবার ওপরে মানুষ সত্য বলে চেঁচিয়েছি—কিন্তু বয়সের সঙ্গে দেখেছি সব ভূয়ো। যে যার সে তার মশাই। বেঁচে থাকাটাই পরম আশ্চর্য! গণেশ হালদার বললেনঃ বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া ত একই কথা। ভেবে দেখুন যৌবনের সেই কলেজ জীবন। কলকাতা আর তার প্রলোভন। আর তার বিপরীত এই জনহীন অরণ্য। দিনের পর দিন কেমন শান্ত সুন্দর ভাবগম্ভীর পরিবেশ।

আপনি বুঝি কবিতা-টবিতা চর্চা করেন? ওসব কথা বই-এ পড়তেই সুন্দর লাগে মশাই, দুদিন থাকুন সব বুঝবেন।

—না কবিতার চর্চা করি না, তবে বনে এসেছি বলে মানুষের ওপর ভক্তি চটে যাবে এমন কথা হয় না।

—মনে হত যদি হৈমর মত—

—হৈম?

—হৈম আমার মেয়ে। যখন এখানে আসি তখন সাত বছরের মেয়ে। আমি থাকি পোষ্ট অফিস আর পড়াশুনা নিয়ে, ওকে দেখাশোনা করত মোতিহারী। আমারও ত্রুটি হয়েছে এক রকম চোখ বুজিয়েই ছিলাম। অথচ মেয়েটা ছিল আমার প্রাণ। মা নেই, বাপও এই রকম, মেয়েটা এই বিচিত্র আবহাওয়ায় একটু বন্যভাবেই বেড়ে উঠল। জানিই না কখন সে বড়ো হয়ে গেছে। তারপর এক রাত্রে—

দুটি হাতে নিজের মুখটা চেপে ধরলেন যামিনীবাবু। গণেশবাবুর কথা বলার সাহস নেই, চুপ করে থাকেন।

আঙুলের ফাঁক দিয়ে যামিনীর মুখ থেকে কথা বেরিয়ে এল···আকাশে সেদিন চাঁদ উঠেছে খুব ঘটা করে। বোধ হয় কার্তিক মাস। শীত তেমন নেই। বেশ গুমোট আছে। কত রাত হয়েছে মনে নেই। এই ঘরটায় একটা বই খুঁজতে এসেছিলাম। হঠাৎ জানালার কাছে গিয়ে দেখি ঐ তিন নম্বর খাদটার ধারে গোল হয়ে দুজনে নাচছে—কারো গায়ে এক টুকরো কাপড় নেই। হৈম আর একটা পাহাড়ে ছেলে নাচছে। তাড়াতাড়ি বই ফেলে নীচে খাদে নেমে গেলাম। ছোঁড়াটা পালাল—আমার পায়ে কি যেন একটা

জড়িয়ে গেল—আমার মনে হ'ল সাপ। হৈমকে পিছন দিক থেকে চুলের মুঠি ধরে ফেললাম। এমন চোখে আমার দিকে তাকাল যেন আমাকে চেনে না। তার গা ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। যখন তাকে পাঁজাকোলা করে ভেতরে নিয়ে এলাম, সে কাঁদতে লাগল চীৎকার করে, সে কান্না যেন উন্মাদের আর্তনাদ।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন যামিনীবাবু—যাই হোক, ভাবলুম ছেলে মানুষ, সঙ্গ-সাথী নেই। তখন হৈমর বয়স দশ হবে। ছোঁড়াটা বছর খানেকের বড়। সাধারণ ছেলে। বাপটা খ্রীস্টান। দিন কতক গয়া ষ্টেশনে বুঝি পয়েণ্টস্‌ম্যান ছিল, সেই সময় ফিরিঙ্গিদের বাড়ি থেকে কিছু পড়তে শিখেছে ছেলেটা। এখানকার ঘাগুরু সর্দারের ছেলে, ছোঁড়াটার নাম রতনু। কদিন বড় মনঃকষ্টে কাটল। তারপর একটা উইক এণ্ডে ওকে নিয়ে সোজা কোলকাতায় চলে এলাম। দেখে শুনে একটা ভালো বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দিলাম। সেই রাত্রির কথা আর ভুলিনি।

হালদার বলে ঃ ছেলেমানুষী খেয়াল আর কি।

একথা কানে না তুলে যামিনীবাবু বলে চললেন ঃ তারপর ক্রমে সময় হয়ে এল, একদিন হৈম হঠাৎ ফিরে এল। সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট চিঠি লিখেছিলেন পড়াশুনা ভালো করে না, নিয়ে যান। নিয়ে এলাম, একেবারে অন্য মানুষ। বেশ ডাগর হয়েছে। চেহারায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। মনে মনে ভাবলাম এইবার মার একটা বিয়ে দোব।

মেয়ে কিন্তু বলে—না বাবা, এখন দিনকতক ঘর সংসার করি তোমার কাছে। কথাটা ভালো। কোনোদিন ওসব ভাবিনি। জীবনটাই চালিয়ে এসেছি অন্যভাবে এতদিন। বললাম বেশ।

হালদারমশাই বললেন ঃ ভালোই করেছেন ত! চতুর্দিকে তাকিয়ে যামিনীবাবু বললেন ঃ বাড়ীটা কেমন দেখছেন। বেশ পরিষ্কার ঠেকছে? নিশ্চয়ই অপরিষ্কার? কিন্তু হৈম যখন ছিল তখন এ রকম ছিল না। তখন আমি পরমানন্দে দিন কাটিয়েছি। জীবনে বোধ হয় এতখানি সুখ আর হয় নি। কোনদিন ভাবি নি, এই নির্জন প্রান্তরে আমার মত একটা বুড়োর ঘর সংসার চালানো একটা পূর্ণযৌবনা তরুণীর পক্ষে কত কষ্টকর। জানতাম মোতিয়ারা, দোটি, রিগলী, টেকু এইসব জংলী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ওর মেলামেশা অনেক বেশী। ওইসব জংলীদের জীবন যে কেমন তা জানতাম। হাঁড়িয়া

খাওয়াটা যাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ আর সুবিধে পেলেই যারা যে কোনো স্ত্রীলোককে কাছে পেয়ে তাকে নিয়ে পালায়, তাদের চরিত্র কেমন ধরুন। দরকার হলে মানুষ খুন করতেও ওদের বাধে না।

ওদের মধ্যে ছিল সেই খ্রীষ্টান রতনুটা, যার কথা বলেছি আপনাকে। বেটা খ্রীষ্টান, আর যাই হোক রক্তের একটা ধারা আছে ত! বেটারা পশু মশাই, একেবারে পশু।

থামলেন বৃদ্ধ যামিনী ঘোষ। যখন আবার কথা বলতে শুরু করলেন তখন অনেকখানি শক্তি সঞ্চয় করেছেন। বললেন, একদিন এমনই বর্ষাকাল, আকাশ সেদিন এমনই জলে ভরা, হঠাৎ কেমন মনে হ'ল কোথায় একটা কি ঘটেছে। শুনিনি কিছুই। বলেছি ত' আপনাকে, কানে কম শুনি। কিসের যেন গন্ধ ভেসে আসছে। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ওর শাড়িটা কাদায় মাখামাখি, হয়ত পথে পড়ে গিয়েছিল, ব্লাউজটা ছিঁড়ে গিয়েছে, বেশী আর কি বলব, বুঝতেই পারছেন।

বকলুম খুব, গাল দিলাম, হয়ত রাগের বসে দু-চার ঘা মেরেছি সে-রাতে। পড়ে দিন কাটাই, জীবনের কি জানি বলুন! আরও কত কি রয়েছে চারধারে। আস্তে আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সারারাত আর চোখে ঘুম নেই। মা-হারা মেয়েটার কথা ভাবতে লাগলাম। কেমন যেন দৃষ্টিহীনার মত নীরবে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

পরদিন সকালে এখানে এঘরে এসে হাজির। মোটেই একটুকু দুঃখু নেই। বরং যেন উদ্ধত ভাব।

এই প্রথম বুঝলাম হৈমর কি হয়েছে। সে সব ভুলে গিয়ে এই বন্য লোকগুলির আদিম রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়েছে, ওদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গেছে। সে বললে স্পষ্ট, ওদের জীবনই নাকি তার ভালো লাগে। তাছাড়া সে সন্তানবতী।

ঘরের ভিতর যদি বজ্রাঘাত হ'ত, যদি ছাত ভেঙে পড়ত হয়ত এতটা আশ্চর্য হতাম না। মেয়ে তারপর বলল, ওকে যেন না ছুঁই। কোনো অধিকার নেই ওকে ছোঁয়ার।

আমার মাথায় কেমন যেন পাগলামির ঘোর লাগল। মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। প্রচণ্ড একটা চড় মারলাম ওর গালে। ঐখানটায় লুটিয়ে

পড়ল, দাঁতে জিভ লেগে রক্তও বুঝি পড়েছিল একটু। কে দায়ী জানতে চাইলাম। হতভাগীর লজ্জা হ'ল না এতটুকু, স্পষ্ট বলল—

রতনু। ওকে ছেড়ে দিয়ে ছুটলাম খাদের দিকে। রতনু এই সময়টা সেখানে থাকে। জলবৃষ্টিতে পাগলের মত দৌড়তে থাকি।

খাদের মুখটায় পৌঁছলাম। তিনজন তখন কাজ করছিল। রতনু, লাটুয়া আর একজনকে জানতাম না।

দেখলাম পাথরে ডিনামাইট, চার্জ ঠিক করছে। সেই সময়টাতেই সবে আসার উদ্যোগ করছে। নিশ্চয়ই ফিউজে আগুন দিয়েছে। তাড়াতাড়ি একটা নিরাপদ আশ্রয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

ওরা সরতেই, বৃষ্টিতে আলগা হয়েছিল একটি মাটির স্তূপ—ঠিক ওদের ওপর পড়ার উপক্রম। একজন সরে গেছে। শুনতে পেলাম রতনুটা চেঁচাচ্ছে। তারপর এক লাফে সেও সরে গেল। মাটির তালটা পড়ল লাটুয়ার গায়ে। বেচারা চাপা পড়ে গেল। একেবারে জীবন্ত সমাধি।

আমি নড়তে পারিনা, চীৎকার করতেও পারিনা। যেন বৃষ্টির পর্দার ফাঁকে পুতুল নাচ দেখছি। রতনু পাথরের চাঙড়টার দিকে তাকাল, জানে যে কোনো মুহূর্তে ডিনামাইট ফাটবে। তারপর সেই লাটুয়ার বুকের ওপর থেকে মাটির তাল সরাতে থাকে। ওর গায়ে শক্তিও অসীম। প্রকাণ্ড মাটির স্তূপ দু হাতে সরিয়ে ফেলল।

তারপর পাথর কাটতে শুরু হ'ল। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হ'ল যেন এক যুগ। সমগ্র ঘটনাটি যেন ছায়াচিত্রের মত ঘটছে চোখের সামনে।

প্রথম তিনবার ঘন ঘন বিস্ফোরণ হ'ল, তারপর আরো দুবার। তারপর নিয়মিতভাবে চারবার—অনেক পরে একবার। পালাতে পারল না রতনু। বিস্ফোরণের ধাক্কা সইতে না পেরে ও মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য বিড়ালের মত ঠিক আবার উঠে দাঁড়ায়—গায়ে হাতের কাদা মোছে।

পরবর্তী দুবারে সেই দেহটির অর্ধাংশ মাটি থেকে টেনে বার করল। কোন রকমে মুখটা বাঁচাবার চেষ্টা করে রতনু। বাকী চারবারের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। মাটিতে শুয়ে অতি কষ্টে পড়ে রইল। এর পর ভীষণ বিস্ফোরণে শূন্যে ছিটকে পড়ল রতনু। আর বাঁ হাতটা মাটিতে

অসাড় হয়ে পড়ে রইল। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রতনু সেই আহত লোকটিকে প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধার করল। সঙ্গে সঙ্গে আর একবার পাথর ফাটল, দু জনেই মাটিতে গড়ায়, যেন কাটা পাঁঠার মত তাদের ছটফটানি।